‘পদ্মাবতী’ কাব্যের সমাজ ও সংস্কৃতি

ভারতী রানী হালদার

404175
Dhaka University Library
404175

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

ডিসেম্বর–২০০৬

Dhaka University Institutional Repository

404175

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

‘পদ্মাবতী’ কাব্যের সমাজ ও সংস্কৃতি

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ)

তত্ত্বাবধায়ক

মনোয়ারা হোসেন
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

গবেষক

ভারতী রানী হালদার
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ভারতী রানী হালদার কর্তৃক উপস্থাপিত 'পদ্মাবতী' কাব্যের সমাজ ও সংস্কৃতি শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত।

এ অভিসন্দর্ভ বা এর কোন অংশ গবেষক অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেন নি।

২৭/১২/২০০৬

মনোয়ারা হোসেন

গবেষণা, তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

ভূমিকা		১
প্রথম অধ্যায়	কবি পরিচিতি ও পদ্মাবতী কাব্যের কাহিনী (জায়সী ও আলাওল অনুসারে)	৪
দ্বিতীয় অধ্যায়	প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্য (চর্যাপদ, রামায়ণ, মহাভারত ও মঙ্গল কাব্যের সমাজ ও সংস্কৃতি)	১৯
তৃতীয় অধ্যায়	বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানমূলক কাব্য (লায়লী-মজনু, ইউসুফ-জোলেখা ও সতীময়না লোরচন্দ্রাণী কাব্যের সমাজ ও সংস্কৃতি)	৪৫
চতুর্থ অধ্যায়	পদ্মাবতী কাব্যের সমাজ ও সংস্কৃতি	৯৫
উপসংহার		১৪৩
গ্রন্থপঞ্জি		১৫১

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

আলাওল (১৬০৫–১৬৭৩ খ্রিঃ) মধ্যযুগের কাব্যপ্রবাহে অন্যতম প্রধান কবি। কবিত্বে ও পাণ্ডিত্যে তাঁর তুল্য কবি সে যুগে বিরল। তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান 'পদ্মাবতী' (১৬৪৫-'৫২) কাব্যটি। আলাওলকে পাঠক সমাজে পরিচিত করার অবদান মূলত আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের। আলাওলের রচনা হয়ত সংখ্যায় খুব বেশি নয় কিন্তু এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিশাল। তাঁর রচনার সামগ্রিক আলোচনা তেমন হয়নি। সৈয়দ আলী আহসান, ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ এবং দেবনাথ বন্দোপাধ্যায় তাঁর রচনা সম্পাদন করেছেন। ডক্টর আহমদ শরীফের *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ* এবং ডক্টর ওয়াকিল আহমদের *বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানে* আলাওলের 'পদ্মাবতী' সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা আছে। ডক্টর অমৃতলাল বালা *আলাওলের কাব্যে হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতি* নামক (গবেষণা) গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশের প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স শ্রেণী এবং এম.এ ক্লাসে আলাওলের রচনা বিশেষ করে 'পদ্মাবতী' কাব্যটি সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত। আমার গবেষণার বিষয় পদ্মাবতী কাব্যের সমাজ ও সংস্কৃতি। কিছুটা হলেও সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আমি আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

'পদ্মাবতী' কাব্যের সমাজ ও সংস্কৃতি বর্ণনার সুবিধার্থে পূর্ববর্তী প্রাচীন ও মধ্যযুগের চর্যাপদ, রামায়ণ, মহাভারত ও মঙ্গল কাব্যের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। এছাড়া পদ্মাবতী কাব্যের পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান মূলক কাব্য 'লায়লী মজনু', 'ইউসুফ জোলেখা' ও 'সতীময়না লোরচন্দ্রাণী' কাব্যের সমাজ ও সংস্কৃতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনার লক্ষ্য হিসেবে অভিসন্দর্ভটিকে ভূমিকা ও উপসংহার অংশ বাদ দিয়ে চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি—

প্রথম অধ্যায় ঃ কবি পরিচিতি ও পদ্মাবতী কাব্যের কাহিনী (জায়সী ও আলাওল অনুসারে)

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্য (চর্যাপদ, রামায়ণ, মহাভারত ও মঙ্গল কাব্যের সমাজ ও সংস্কৃতি)

তৃতীয় অধ্যায় ঃ পদ্মাবতী কাব্যের পূর্ববর্তী সমসাময়িক বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানমূলক কাব্য (লায়লী-মজনু, ইউসুফ-জোলেখা ও সতীময়না লোরচন্দ্রাণী কাব্যের সমাজ ও সংস্কৃতি)

চতুর্থ অধ্যায় ঃ পদ্মাবতী কাব্যের সমাজ ও সংস্কৃতি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর মনোয়ারা হোসেনের তত্ত্বাবধানে আমি আমার অভিসন্দর্ভটি রচনা করি। অভিসন্দর্ভের সার্বিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তথ্যবিন্যাসে তাঁর অবদান অপরিশোধ্য।

আমি ঋণী শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডক্টর আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ ও ডক্টর মুহাম্মদ শাহাজাহান মিয়ার কাছে। আমি আরও ঋণী শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডক্টর রফিকুল ইসলামের কাছে। বই পুস্তক দিয়ে সাহায্য করার পাশাপাশি তাঁদের স্নেহ, অনুপ্রেরণা এবং মূল্যবান দিক নির্দেশনা আমার গবেষণা কর্মকে করেছে সহজ ও গতিশীল। আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি বাংলা বিভাগের সকল কর্মকতা ও কর্মচারীকে। আমি ঋণ স্বীকার করছি আমার সহকর্মী সায়ীদ আবুবকর (প্রভাষক), ইংরেজি বিভাগ, সরকারি লালন শাহ কলেজ, হরিণাকুন্ডু, ঝিনাইদহ কাছে।

গবেষণার জন্য আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সেমিনার, বাংলা একাডেমী লাইব্রেরী ও কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী ব্যবহার করেছি। আমি লাইব্রেরীর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর কাছে কৃতজ্ঞ।

আমার সার্বক্ষণিক পাশে থেকে যারা আমাকে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়েছে তারা হচ্ছে আমার একান্ত সুহৃদ। কোন রকম ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতার প্রত্যাশা এরা রাখে না।

Dhaka University Institutional Repository

আমার আত্মার অচ্ছেদ্য যাঁরা আমার ভালোয় আনন্দে আন্দোলিত ও মঙ্গল কামনায় সতত নিয়োজিত আমার পরিবারের সেই সকল সদস্যকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

এ অভিসন্দর্ভটি অত্যন্ত নিষ্ঠা সর্তকতার সাথে কম্পিউটার কম্পোজ করার জন্য রফিক ভাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছু মুদ্রণ ত্রুটি থেকেই যায়। এ জন্য আমি সবিনয়ে দুঃখ প্রকাশ করছি।

ভারতী রানী হালদার

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

কবি পরিচিতি ও পদ্মাবতী কাব্যের কাহিনী
(জায়সী ও আলাওল অনুসারে)

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্য ছিল অনেকটাই তত্ত্বাশ্রয়ী ও দেবনির্ভর। প্রাচীন যুগের চর্যাপদে পাই বৌদ্ধসহজিয়াদের গূঢ় রহস্যতত্ত্ব। অবশ্য ঐ সময়কার সাহিত্য যতই তত্ত্বাশ্রয়ী হোক না কেন সাধনতত্ত্বের অন্তরালে আমরা সমাজ ও সংস্কৃতির একটা চিত্র পেয়ে থাকি। দেবস্তুতি এবং দেববন্দনা ছিল মধ্যযুগের সাহিত্যের বিষয়বস্তু। মানব মানবীর হৃদয় বৃত্তি নিয়ে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন সাহিত্য ঐ সময়ে রচিত হয়নি। *মঙ্গলকাব্য, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণবপদাবলী* প্রভৃতি যে সমস্ত সাহিত্যকর্ম ঐ সময়ে রচিত তা সবই দেবতার মাহাত্ম্য কীর্তন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন একটি লৌকিক কাব্য পরবর্তীতে চৈতন্যদেব রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক কাব্যে দেবত্ব আরোপ করেন।

আসলে "শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের" অন্যতম প্রধান সার্থকতা এই যে, কি রাধা, কি কৃষ্ণ কেউ এখানে আধ্যাত্মিক বিগ্রহ মাত্র নন; একটু স্থূল হলেও তাঁরা রক্তমাংসে গড়া মানুষেরই প্রতিনিধি। জীবাত্মা পরমাত্মার রূপক নয়, বরং সে দিনের প্রাকৃত জীবনে বড়ু চণ্ডীদাস যে প্রণয় জাল বিস্তার ও প্রণয়-বিলাস প্রত্যক্ষ করে থাকবেন, আর যেমন দেখে থাকবেন বহু সরলা গ্রাম্য বধূর প্রণয় প্রবঞ্চিত জীবনের দুর্দশা ও বেদনা তা অতি সহজভাবে চিত্রিত করেছেন *"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"* কাব্যে। তাই এই কাব্য দেব লীলার কাব্য না হয়ে মানব লীলার কাব্য হয়ে উঠেছে।"[১] মানব হৃদয়ের আর্তিই এখানে প্রকাশিত হয়েছে।

"বৈষ্ণবপদাবলীতে" ধর্মীয় তাৎপর্যের বাইরে অপূর্ব মানবিক আবেদন বিদ্যমান।

মধ্যযুগে সাহিত্যের রূপকার ছিলেন বেশির ভাগই হিন্দুকবি। তাঁরা মানব হৃদয়বৃত্তি নিয়ে তেমন আলোচনা করেননি। দেবদেবীই তাঁদের সাহিত্যসাধনার আরাধ্য বিষয়। মুসলিম কবিসাহিত্যিক তখনও তেমন বেশি প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। মুসলিম কবিসাহিত্যিক কর্তৃক রচিত

Dhaka University Institutional Repository

ঐ সময়কার উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম হচ্ছে শাহ মুহম্মদ সগীর রচিত *ইউসুফ-জোলেখা* দৌলত উজীরের *লায়লী মজনু* এবং আলাওলের *পদ্মাবতী* ও *সতীময়না লোরচন্দ্রাণী*। এ সব কাব্যে আমরা মানব হৃদয়বৃত্তির অন্তরালে তৎকালীন সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয় পাই।

কবি পরিচিতি ঃ

প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবিসাহিত্যিকের জন্মের সঠিক দিন তারিখ পাওয়া যায় না। অনেকটা অনুমান বা বিশেষ কোন ঘটনা বা রাজত্বকাল স্মরণ করে কবিসাহিত্যিকের জন্ম তারিখ নির্ণয় করা হয়। আলাওলের জীবনকাহিনী জানার একমাত্র উপায় হলো কবির আত্মকাহিনী। অনুমান করা যায় তিনি সপ্তদশ শতকের প্রথম দশক (১৫৯৭–১৬৭৩)-এর মধ্যে ফতেহাবাদ বা বর্তমান ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত জালালপুরে জন্মগ্রহণ করেন। *পদ্মাবতী* কাব্যে কবি লিখেছেন —

মুলুক ফতেহাবাদ গৌড়েত প্রধান।
তথাত জালালপুর পূণ্যবন্ত স্থান।।
বহু গুণ বন্ত বৈসৈ খলিফা ওলমা।
কথেক কহিমু সেই দেশের মহিমা।।
মজলিস কুতুব জান তাত অধিপতি।
মুই দীন হীন তান অমাত্য সন্ততি।।
কার্যগতি যাইতে পন্থে বিধির ঘটন।
হার্মাদের নৌকা সঙ্গে হৈল দরশন।।
বহু যুদ্ধ আছিল শহীদ হৈল তাত।
রণক্ষতে ভোগযোগে আইলুম এথাত।।
কহিতে বহুল কথা দুঃখ আপনার।
রোসাঙ্গে আসিয়া হৈলঁ রাজ আসোয়ার।।
বহু বহু মুসলমান রোসাঙ্গে বৈসন্ত।
সদাচার কুলীন পণ্ডিত গুণবন্ত।।
সবে কৃপা করন্ত সম্ভাস বহুতর।

Dhaka University Institutional Repository

তালিব এলেম বুলি করন্ত আদর ।।
মুখ্য পাটেশ্বরীর অমাত্য মহাজন ।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ঠাকুর মাগন ।।
ভাগ্যোদয় হৈল মোর বিধি পরসন ।
দুঃখনাশ হেতু তান সঙ্গেত মিলন ।।
অনেক আদর করি বহুল সম্মান ।
সতত পোষন্ত আমা অন্নবস্ত্র দান ।।
মধুর আলাপে বশ হৈল মোর মন ।
তান গুন সূত্র হৈল গ্রীবাত বন্ধন ।।[২]

সেকান্দার নামা কাব্যে কবি লিখেছেন—

গৌড় মধ্যে প্রধান ফতেহাবাদ ভূম ।
বৈসৈ সাধু সৎ লোক হর্ষ মনোরম ।।
অনেক দানেশ মন্দ খলিফা সুজন ।
বহুত আলিম গুরু আছে সেই স্থান ।।
হিন্দুকুলে মহাসভ্য আছে ভট্টাচার্য ।
ভাগীরথী গঙ্গাধারা বহে মধ্যে রাজ্য ।।
রাজ্যেশ্বর মজলিস কুতুব মহাশয় ।
আমি ক্ষুদ্র মতি তান অমাত্য তনয় ।।
কার্যহেতু পন্থ ক্রমে আছে কর্মলেখা ।
দুষ্ট হারমাদ সঙ্গে হই গেল দেখা ।।
বহু যুদ্ধ করিয়া শহীদ হৈল বাপ ।
রণক্ষতে রোসাঙ্গে আইল মহাপাপ ।।
না পাইল সৎ পদ আছে আঙ্গলেস ।
রাজ আসোয়ার হৈনু আসি এই দেশ ।।
রোসাঙ্গেতে মুসলমান যতেক আছেন্ত ।
তালিব আলিম বলি আদর করেন্ত ।।

Dhaka University Institutional Repository

বহু মহন্তের পুত্র মহা মহা নর।
নাট গান সঙ্গীত শিখাইনু বহুতর।।
বহুল মহন্ত লোক কৈল গুরুভাব।
সকলের কৃপা হন্তে ছিল বহুলাভ।।[৩]

কবির ভাষ্য মতে– ফতেহাবাদের জালালপুর তাঁর জন্মস্থান। মজলিস কুতুব ছিলেন জালালপুরের অধীশ্বর। আলাওলের পিতা ছিলেন মজলিস কুতুবের অমাত্য। মজলিস কুতুবের সময়কাল ১৫৭৬–১৬১১। সুতরাং আলাওলের জন্ম ঐ সময়ের পরে নয়। পিতার সঙ্গে পর্যটনে যাত্রাকালে জলপথে আলাওল জলদস্যু দ্বারা আক্রান্ত হন। কবির পিতা প্রাণ হারান এবং ঘটনাক্রমে কবি প্রাণে বেঁচে যান। তিনি বহু কষ্টে আরাকান বা রোসাঙ্গ রাজ্যে উপস্থিত হন এবং রাজমন্ত্রী কোরেশী মাগন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। তিনি রাজ দরবারে রাজ আসোয়ার বা ঘোর সওয়ারের চাকরি পান। এর ফলে কবির অন্নবস্ত্রের সংস্থান হয়। আলাওল ছিলেন পণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁর পাণ্ডিত্য, সঙ্গীতে নৈপুণ্য, কর্মে একনিষ্ঠতা দেখে মাগন ঠাকুর খুশী হন এবং তিনি মাগন ঠাকুরের কৃপা লাভ করেন। বহুভাষাবিদ মাগন ঠাকুরের নির্দেশে কবি আলাওল মালিক মুহম্মদ জায়সীর হিন্দি কাব্য *পদমাবৎ* এর অনুবাদ শুরু করেন। তিনি ১৬৪৫–৫২ এর মধ্যে অনুবাদকর্ম সমাপ্ত করেন। এছাড়া তিনি মাগন ঠাকুরের নির্দেশে *সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জমাল* কাব্য অনুবাদ আরম্ভ করেন। ১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দে মাগন ঠাকুরের অকস্মাৎ মৃত্যুর ফলে আলাওল কাব্য অনুবাদে বিরত হন। ১৬৫৯ সালে কবি আরাকান রাজ্যের মহামাত্য সোলেমানের আদেশে দৌলত কাজীর অসমাপ্ত কাব্য *সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী* সমাপ্ত করেন। এরপর ১৬৬০ খ্রি. আলাওল সৈয়দ মুহম্মদের পৃষ্ঠপোষকতায় নিজামীর ফারসী কাব্য *"হপ্তপয়কর"* অনুবাদ *"সপ্তপয়কর"* রচনা করেন। সপ্তপয়করে যুবরাজ শাহ সুজার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৬৬০ খ্রি. গৃহ যুদ্ধ বিড়ম্বিত সুজা আওরঙ্গজেবের প্রধান সেনাপতি মীর জুমলার হাতে পরাজিত হয়ে আরাকানে আশ্রয় নেন এবং ভাগ্য বিড়ম্বনায় আরাকানের বিরাগ ভাজন হওয়ায় সপরিবারে নিহত হন। ঘটনার দুর্বিপাকে আলাওল মিথ্যা

Dhaka University Institutional Repository

অভিযোগে পঞ্চাশ দিন কারাবরণ করেন। তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয় এবং তিনি মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু সম্পদ বাজেয়াপ্ত হওয়ায় তিনি চরম অভাবের সম্মুখীন হন, এই সময়ে তিনি ইসলামী স্মৃতি শাস্ত্র *তোহফা* ১৬৬৪–৬৫ এর মধ্যে সমাপ্ত করেন। ১৬৬৯ খ্রি. সৈয়দ মুহম্মদের নির্দেশে তিনি *সয়ফুল মুলুক বদি-উজ্জামাল* কাব্যের অসমাপ্ত অংশ সমাপ্ত করেন। কবির সর্বশেষ রচনা *সেকান্দারনামা* মজলিস নবরাজের পৃষ্ঠপোষকতায় রচনা করেন। ১৬৬০ খ্রি. অপবাদের গ্লানিতে কবির জীবনে যে দুঃখ দুদর্শা নেমে এসেছিল দীর্ঘ এগার বছর পর (১৬৭১) খ্রি. মজলিসের অনুগ্রহে তাঁর জীবনে আবার সুদিন ফিরে আসে। নিজামীর বৃহৎ ফারসি কাব্য *'ইস-কন্দর নামার'* অনুবাদ করতে বৃদ্ধ কবির কয়েক বছর সময় লাগে। কবির আত্মপরিচয় থেকে সহজেই অনুমিত হয় যে, কবি সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান ছিলেন কিন্তু ভাগ্য-বিড়ম্বনার কারণে তিনি সুখ ভোগ করতে পারেননি। পিতৃহারা, বাস্তুহারা হয়ে তিনি দুঃখকষ্ট ভোগের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করেন। রাজ অমাত্যের সন্তান হিসেবে তিনি ছিলেন যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী। তাই পর্যটন কালে জলদস্যুদের সাথে যুদ্ধ করে পিতৃহারা হন বটে কিন্তু নিজের জীবন রক্ষা করেন। রোসাঙ্গ রাজ্যে এসে তালিবএলেম হিসেবে সুধীগণের মনোরঞ্জন করেন এবং রাজআসোয়ার বা ঘোর সওয়ারের চাকরি গ্রহণ করেন। আলাওল ছিলেন মসীজীবী। ভাগ্য বিড়ম্বনার কারণেই তিনি উক্ত চাকরি করতে বাধ্য হন কিন্তু স্বীয় প্রতিভার গুণে তিনি রোসাঙ্গ রাজ্যে আপন আসন লাভ করে সকলের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন।

আলাওলের প্রথম এবং সর্বোৎকৃষ্ট রচনা হচ্ছে *পদ্মাবতী*। সুতরাং *পদ্মাবতী* আলাওলের পরিণত বয়সের রচনা। পদ্মাবতীর আত্মপরিচয় অংশে কবির শৈশব হতে পরিণত বয়সের কাহিনী বিধৃত। এখানে কবির যে জীবন প্যাটার্ন পাওয়া যায় তা থেকে অনুমিত হয় গৌড় বঙ্গের অন্যতম স্থানগুলোর মধ্যে ফতেহাবাদ ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তার অন্তবর্তী জালালপুর গ্রামটি ছিল গুণীজনদের আবাসস্থল, আর গুণী কবি আলাওল এই গ্রামেই জন্ম গ্রহণ করেন। মাগন ঠাকুর আলাওলের প্রতিভায় সন্তুষ্ট হন এবং

Dhaka University Institutional Repository

আলাওলকে তাঁর সভার অন্যতম সভাসদ নিযুক্ত করেন। কোন এক গুণি সমাবেশে মাগন ঠাকুর মালিক মুহম্মদ জায়সীর *পদমাবৎ* কাব্যকাহিনী শুনে খুশী হন এবং সরস পয়ারে অনুবাদ করার জন্য আলাওলকে আজ্ঞা করেন—

একদিন মহাশয় বসিয়া আসনে।
নানা রস প্রসঙ্গ কহন্ত গুণিগণে।।
.....
হেন কালে শুনি পদ্মাবতীর কথন।
পরম হরিষ হৈল আনন্দিত মন।।
কৌতুকে আদেশ কৈলা পরম হরিষে।
পূর্ণ দ্বিজরাজে যেন অমিয়া বরিষে।।
এহি পদ্মাবতী রসে রচ রসকথা।
হিন্দুস্থানী ভাষে শেখে রহিয়াছে পোথা।।
রোসাঙ্গতে অনেকে না বুঝে এই ভাষা।
পয়ার রচিলে পুরে সভানের আশা।।[৪]

মাগন ঠাকুরের এই আদেশকে শিরোধার্য মনে করে কবি *পদ্মাবতী* কাব্য অনুবাদে আত্মনিয়োগ করেন—

একথা শুনিতে মনে বহু শ্রদ্ধা করি।।
তাহান আদেশ মাল্য পুরিয়া মস্তক।
অঙ্গীকার কৈলু মুঞি রচিতে পুস্তক।।[৫]

যেহেতু *পদ্মাবতী* কাব্যটি আলাওলের পরিণত বয়সের রচনা তাই কবি মনের পরিপক্বতা আলোচ্য কাব্যে প্রকাশ পায়। পাণ্ডিত্ব এবং মেধার সম্মিলন ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত। তাঁর রচনাভঙ্গি অত্যন্ত শুদ্ধ, পরিমার্জিত এবং পরিশীলিত। তিনি ছিলেন সুরুচিপূর্ণ লেখক। তাঁর রচনা কর্ম বাংলা সাহিত্যের দুর্লভ প্রাপ্তি। নিম্নে আলাওলের প্রধান রচনাগুলি উল্লেখ করা হলো—

Dhaka University Institutional Repository

(১) পদ্মাবতী —— সতের শতক (১৬৪৫–১৬৫২)

(২) সপ্তপয়কর —— (১৬৬০)

(৩) তোহফা (স্মৃতি শাস্ত্র) —— ১৬৬৫

(৪) সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল——১৬৬৯ (শেষ অংশ সমাপ্ত করেন)

(৫) সেকান্দর নামা—— (১৬৭৩)

(৬) সতীময়না লোরচন্দ্রাণী— (১৯৫৯) অসমাপ্ত অংশ সমাপ্ত করেন।

আনুমানিক ১৬৭৩–৭৪ সালের মধ্যে এই মহান পণ্ডিতের জীবনাবসান ঘটে।

পদমাবৎ কাব্যের কাহিনী

মালিক মুহম্মদ জায়সীর *পদমাবৎ* কাব্যের কাহিনীটি ঐতিহাসিক নয়; কিছুটা ইতিহাস, কিছুটা রূপক এবং তাত্ত্বিক রূপ কথাচিত রোমান্টিক প্রেমকাব্য। কাব্যটি দুটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে রত্নসেন, নাগমতি ও পদ্মাবতী কাহিনী। দ্বিতীয় ভাগে রত্নসেন, পদ্মাবতী ও আলাউদ্দীন কাহিনী। প্রথম অংশ অনৈতিহাসিক একটি রাজ পরিবারের কাহিনী এবং দ্বিতীয় অংশটি অর্ধ-ঐতিহাসিক রূপজ মোহে দ্বন্দ্ব কাহিনী।

সিংহল রাজকন্যা পদ্মাবতীর প্রিয় শুক পাখির নাম হিরামণ। যৌবনবতী পদ্মাবতীর জন্য তার দেশ দেশান্তর হতে বর খুঁজে আনার প্রস্তাব শুনে রাজা ক্রুদ্ধ হন এবং পাখিটিকে মেরে ফেলার আদেশ দেন। পদ্মাবতীর অনুরোধে পাখিটি প্রাণে বাঁচে বটে তবে এক ব্যাধের হাতে ধরা পড়ে সিংহল হাটে জনৈক ব্রাহ্মণ কর্তৃক ক্রীত হলো। ব্রাহ্মণ পাখিটিকে চিতোরের রাজা রত্নসেনের কাছে এক লক্ষ টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে। শুক পাখির মুখে পদ্মাবতীর রূপের কথা শুনে ঈর্ষায় ক্রুদ্ধ হয়ে রাণী নাগমতি পাখিটিকে হত্যা করার আদেশ দেন। ধাত্রীর সহায়তায় হিরামণের প্রাণ রক্ষা হয়। যথা সময়ে শুকের মুখে পদ্মাবতীর রূপের কথা শুনে রাজা রত্নসেন যোগীবেশে পাখিটিকে নিয়ে সিংহল অভিমুখে যাত্রা করেন। সেখানে শুক পাখির সহায়তায় রত্নসেন ও পদ্মাবতীর সাথে গোপনে সাক্ষাৎ

Dhaka University Institutional Repository

হয় এবং প্রাথমিক বাধা বিপত্তির পর হরগৌরীর সহায়তায় পদ্মাবতীর সাথে রত্নসেনের বিয়ে হয়। শুকের মুখে নাগমতির দুঃখ ও বিরহের কথা শুনে রত্নসেন পদ্মাবতীকে নিয়ে চিতোর অভিমুখে যাত্রা করেন; পথে অনেক বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে স্বদেশে ফিরে এসে দুই স্ত্রী নাগমতি ও পদ্মাবতীকে নিয়ে সুখে রাজ্য পরিচালনা করতে থাকেন। নাগমতির গর্ভে নাগসেন এবং পদ্মাবতীর গর্ভে কমলসেন নামে রত্নসেনের দুটি পুত্র সন্তান হয়। এদেরকে নিয়ে রাজা সুখে দাম্পত্য জীবন কাটাতে থাকেন। কাহিনীর প্রথমাংশ এ পর্যন্তই। এখানে প্রেম ও রোমান্স বর্ণিত হয়ে মিলনান্তক কাহিনীতে পরিণত হয়েছে।

কাহিনীর দ্বিতীয়াংশে আমরা হিংসা, দ্বেষ ও রূপজ মোহের দ্বন্দ্ব দেখতে পাই। যাদু বলে প্রতিপদে দ্বিতীয়ার চাঁদ দেখিয়ে রাজা ও পারিষদ বর্গকে প্রতারিত করার অভিযোগে রাঘবচেতন নামে এক ব্রাহ্মণকে রাজা চিতোর থেকে নির্বাসনে প্রেরণ করেন। যাত্রাকালে করুণাবশত ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করার জন্য পদ্মাবতী রাঘবচেতনকে নিজ হাতের কঙ্কণ উপহার দেন। কিন্তু ক্রুদ্ধ রাঘবচেতন এতে সন্তুষ্ট না হয়ে বরং প্রতিশোধ নেয়ার জন্য দিল্লি গিয়ে সম্রাট আলাউদ্দীনের কাছে পদ্মাবতীর রূপের ভূয়সী প্রশংসা করেন। প্রশংসা শুনে আলাউদ্দীন শ্রীজা নামক এক বিপ্রকে চিতোর পাঠান পদ্মাবতীকে দাবি করে। রত্নসেন এ অন্যায় দাবি প্রত্যাখ্যান করলে আলাউদ্দীন দীর্ঘকাল চিতোর অবরোধ করে রাখেন কিন্তু যুদ্ধে জয়ী হতে না পেরে কপট সন্ধিতে রত্নসেনকে পরাজিত করেন এবং বন্দি করে নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন। ইত্যবসরে কুম্ভলনের নৃপতি দেবপাল পদ্মাবতীর কাছে কুমুদিনী নামে এক দূতিকে পাঠান পদ্মাবতীকে ভুলানোর জন্য, আলাউদ্দীনও একই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এক দূতি পাঠান কিন্তু দু'জনেই চরমভাবে ব্যর্থ হন। রত্নসেনের দুই বিশ্বস্ত সেনাপতি গোরা ও বাদলের কূটকৌশলে রাজা বন্দি অবস্থা থেকে মুক্তি পান কিন্তু পশ্চাদধাবিত সৈন্যদের সাথে যুদ্ধে গোরা নিহত হন। চিতোরে ফিরে পদ্মাবতীর কাছে দেবপালের দুরভিসন্ধির কথা শুনে রাজা দেবপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং স্বহস্তে তাকে নিধন করে নিজে আহত অবস্থায় রাজ্যে ফিরে এসে

Dhaka University Institutional Repository

মৃত্যুবরণ করেন। নাগমতি ও পদ্মাবতী সহমৃতা হন। ইতিমধ্যে আলাউদ্দীন পুনরায় চিতোর আক্রমণ করেন। এবার যুদ্ধে বাদল নিহত হন। সুলতান চিতোর অধিকার করেন এবং ভস্মাবশেষ দেখে দিল্লিতে ফিরে যান। জায়সীর বর্ণনায় পদ্মাবতীর কাহনী এখানেই সমাপ্ত।

পদ্মাবতী কাব্যের কাহিনী

মালিক মুহম্মদ জায়সীর হিন্দি কাব্য *পদমাবৎ*-এর মূল কাহিনী অবলম্বনে আলাওল *পদ্মাবতী* কাব্যটি অনুবাদ করেন। আলাওলের *পদ্মাবতী* কাব্যে মূল অনুযায়ী দু'টি পৃথক রসের প্লট পাই। প্রথমটিতে আছে নাগমতি, পদ্মাবতী ও রত্নসেনের মিলনান্তক কাহিনী যেখানে রোমান্স রস প্রাধান্য পেয়েছে। দ্বিতীয় অংশে রত্নসেন, আলাউদ্দীন-পদ্মাবতীর রূপজমোহ যেখানে ত্রিভুজ প্রেমের কাহিনী প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু মুখ্য হয়েছে যুদ্ধের উন্মাদনা। শেষের কাহিনীটি মূলে ট্রাজিক কিন্তু আলাওলের অনুবাদে তা রোমান্সে পরিণত হয়েছে।

সিংহল রাজকন্যার প্রিয় শুক পাখির নাম হীরামণি। রাজদোষে পাখিটি পলায়ন করে এক ব্যাধের হাতে ধরা পড়ে; ব্যাধের কাছ থেকে এক ব্রাহ্মণ কর্তৃক পাখিটি ক্রীত হয়। ব্রাহ্মণ এই বেদজ্ঞ পাখিটি চিতোরের রাজা রত্নসেনের কাছে এক লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করে। রাজরাণী নাগমতির প্রশ্নের উত্তরে হীরামণি পদ্মাবতীর রূপের প্রশংসা করলে রাণী ক্রুদ্ধ হয়ে পাখিটিকে মেরে ফেলার আদেশ দেন কিন্তু ধাত্রী পাখিটি না মেরে রাজার হাতে সমর্পণ করে। রাজা পাখির মুখে পদ্মাবতীর রূপের কথা শুনে প্রণয়াসক্ত হন এবং ষোল শ অনুচর নিয়ে সিংহল অভিমুখে যাত্রা করেন। উড়িষ্যাপতি রত্নসেনকে বহিত্র দিলেন। সিংহলে এসে হীরামণির সহায়তায় শ্রী পঞ্চমীর তিথিতে মহাদেব মন্দিরে পদ্মাবতীর সাথে রত্নসেনের সাক্ষাৎ হয়। রাজা সাক্ষাতেই প্রণয় মূর্ছিত হন। সুগন্ধি জল দিয়ে পদ্মাবতী রত্নসেনকে সেবা করলেন। চন্দন দিয়ে অঙ্গে লিখলেন *তোমা দরশনে আইলুঁ করি পূজা ছল।*[৬] এরপর বিমর্ষ বদনে পদ্মাবতী গৃহে ফিরে গেলেন। জ্ঞান ফেরার পর রাজা নিজ অঙ্গে চন্দনের লেখা পড়ে

Dhaka University Institutional Repository

আরও প্রেমদগ্ধ হন। গোপনে সিংহল দ্বীপে প্রবেশ করতে গিয়ে অনুচরসহ ধরা পড়েন। সিংহল রাজা তাঁকে শুলে দেবার আদেশ দেন কিন্তু ভাটের মুখে রত্নসেনের পরিচয় পেয়ে রাজসভায় নানাবিধ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর রাজা সংশয়মুক্ত হন এবং স্বীয় কন্যার সাথে রত্নসেনের বিবাহের আয়োজন করেন। মহা আড়ম্বরে বিবাহ সমাপ্ত হয়। পদ্মাবতীর সঙ্গে এক বছর সম্ভোগের পর শুক পাখির মুখে নাগমতির দুঃখ ও বিরহদশার কথা শুনে রত্নসেন পদ্মাবতীকে নিয়ে চিতোর অভিমুখে যাত্রা করেন। স্বদেশে ফেরার পথে রত্নসেন নিজের অহংকারের জন্য রাজা সমুদ্র কর্তৃক বিপর্যস্ত হন। অবশেষে দুর্যোগ ও বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। মানিনী নাগমতিকে তুষ্ট করে রত্নসেন পদ্মাবতী ও নাগমতি দুই রাণীর সঙ্গে সুখে জীবন কাটাতে থাকেন। পদ্মাবতী কাব্যের প্রথমাংশ এখানেই শেষ। এখানে আছে প্রেম ও রোমান্স মিশ্রিত রস কথা। সুখী ও সুন্দর একটি রাজ পরিবারের জীবন কথা। এই অংশটি মিলনাত্মক কাহিনী। শত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও এখানে নায়ক ও নায়িকার মিলন দেখানো হয়েছে। এখানে আছে রূপকথা ধর্মী কমেডির সুর।

"পদ্মাবতী" কাব্যের দ্বিতীয় অংশে আমরা ট্রাজিক পরিণতি দেখি। রূপজ মোহ এই ট্রাজেডির জন্য দায়ী। ত্রিভুজ প্রেমের ইঙ্গিতও এখানে দেখা যায়। পদ্মাবতী, রত্নসেনের সুখের জীবনে হঠাৎ নেমে আসে ঘনমেঘ। তাঁদের রোমান্টিক প্রণয় লীলার মাঝে শোনা যায় দিল্লীশ্বরের সেনাবাহিনীর পদধ্বনি। ফলে ব্যক্তিগত প্রেমকাহিনী ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে স্থাপিত হয়। জায়সীর অনুসরণে আলাওল যদিও এই কাহিনী পর্বটি অনুবাদ করেন তবুও মূলের সঙ্গে এই অনূদিত অংশের শেষাংশে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

প্রতিপদের রাতে দ্বিতীয়ার চাঁদ দেখানোর প্রতারণার দায়ে রাজা রাঘবচেতনকে নির্বাসন দণ্ড দেন। অপমানিত রাঘবচেতন পদ্মাবতী প্রদত্ত কঙ্কণ নিয়ে দিল্লীশ্বরের কাছে পদ্মাবতীর রূপ বর্ণনা করে তাঁকে উন্মত্ত করে তোলে। প্রতিহিংসার ফলস্বরূপ রাঘবচেতন এ কাজটি করে। পদ্মাবতীর রূপের কথা শুনে আলাউদ্দীন শ্রীজা নামক এক বিপ্রকে রত্নসেনের কাছে

Dhaka University Institutional Repository

পাঠান পদ্মাবতীকে দাবি করে। এতে রাজা ভীষণ ক্রুদ্ধ হন এবং এ দাবি অগ্রাহ্য করেন। এই প্রস্তাবে প্রত্যাখ্যাত হয়ে দিল্লীশ্বর ক্রুদ্ধ হন এবং সসৈন্যে চিতোর এসে আট বছর চিতোর অবরোধ করে রাখেন। তারপরও রাজধানী দখল করতে না পেরে সন্ধির প্রস্তাব করে রত্নসেনের আমন্ত্রণে রাজধানীতে প্রবেশ করেন। রাজার সাথে পাশা খেলার সময় হঠাৎ মুকুরে প্রতিফলিত পদ্মাবতীর রূপ দেখে রাজা বিমোহিত হন এবং খেলায় হেরে যান। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী আলাউদ্দীন দিল্লি প্রত্যাবর্তন কালে রাজাকে বন্দি করে রাজধানীতে নিয়ে যান। রত্নসেনের অনুপস্থিতির সুযোগে কুম্ভলনের রাজা দেবপাল এবং স্বয়ং দিল্লীশ্বর তাঁদের স্বীয় বাঞ্ছা পূরণের উদ্দেশ্যে পদ্মাবতীর কাছে নিজ নিজ দূতি পাঠান কিন্তু উভয়ে পদ্মাবতীকে অনুগত করতে ব্যর্থ হয়। এরপর পদ্মাবতীর অনুরোধে বিশ্বস্ত সেনাপতি গোরা ও বাদল সুকৌশলে রত্নসেনকে উদ্ধার করে চিতোর নিয়ে আসে। ষোল শ পালকিতে ষোল শ রাজপুত যোদ্ধা রমণীর ছদ্মবেশে দিল্লিতে প্রবেশ করে রত্নসেনের সঙ্গে সখীসহ পদ্মাবতীর সাক্ষাতের অছিলায় রাজাকে মুক্ত করে ফিরে আসার সময় পশ্চাদধাবী সৈন্যের হাতে গোরা নিহত হয়।

আলাওলের কাহিনী এ পর্যন্ত মোটামুটি জায়সীর *পদমাবৎ* কাহিনীর বিশ্বস্ত অনুকরণ। কিন্তু শেষ ভাগে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। চিতোরে ফিরে এসে রাজা পদ্মাবতীর কাছে দেবপালের দুরভিসন্ধির কথা শুনে ক্রুদ্ধ হন এবং তাকে নিধন করার জন্য যুদ্ধ যাত্রা করেন। যুদ্ধে দেবপাল নিহত হয় এবং রত্নসেন আহত হয়ে চিতোর ফিরে আসেন। বিষাক্ত দেহ নিয়ে রত্নসেন চিতোর আসার পর আরও কয়েক বছর জীবিত ছিলেন। ইতিমধ্যে পদ্মাবতীর গর্ভে চন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেন নামে দুই পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। চন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনের বয়স যখন সাত ও পাঁচ বছর তখন বিষ প্রকোপে রত্নসেন মৃত্যুবরণ করেন। নাগমতি ও পদ্মাবতী স্বামীর চিতায় সহমৃতা হন। চন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেন পিতার আদেশ অনুযায়ী আলাউদ্দীনের বশ্যতা স্বীকার করেন।

Dhaka University Institutional Repository

সেনাপতি বাদলের সঙ্গে চন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেন দিল্লি এসে সুলতানকে পিতার মৃত্যু সংবাদ দিলে আলাউদ্দীন খুবই ব্যথিত হন এবং রত্নসেনের পুত্রের সাথে প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করেন। সুলতান একজনকে চন্দ্রেরী এবং অন্যজনকে মাড়োয়া রাজ্য দান করেন। গোরা যে সব রাজাকে যুদ্ধে বধ করেছিল সে সব রাজ্য বাদলকে দান করেন। অতঃপর বার বছর চিতোরে রাজকুমারের সঙ্গে বাস করে অবশেষে সুলতান দিল্লি প্রত্যাবর্তন করেন এবং চিতোরকে ইসলাম-রাজ্য ঘোষণা করেন।

জায়সীর উপাখ্যানের শেষাংশ এবং আলাওলের অনুবাদের সমাপ্তিতে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। তাঁদের কাব্যদ্বয়ে এ বিস্তর পার্থক্যের কারণ সম্ভবত, তাঁদের জীবন রস বোধ। জায়সী ছিলেন সাধক কবি। সূফী সাধক হিসেবে জগৎ ও জীবনের নশ্বরতাকেই তিনি তাঁর কাব্যে উপস্থাপন করেছেন।

আলাওল সূফী কবি কিন্তু তিনি জীবন রসিক। জীবন ভোগের তত্ত্বই তাঁর কাব্যে প্রাধান্য পেয়েছে। জীবনবাদী কবি আলাওল তাই দেবপালের সাথে যুদ্ধে আহত হওয়ার পরও রত্নসেনকে দীর্ঘ বার বছর বাঁচিয়ে রাখেন জীবনের স্বাদ পাওয়ার জন্য। এরই মধ্যে তিনি চন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেন নামে দুই পুত্র সন্তানের জনক হয়েছেন। জীবন রসিক না হলে তিনি রত্নসেনকে বাঁচিয়ে রেখে কাহিনী বিস্তৃত করতেন না। শুধু রত্নসেন নন; আলাওলের হাতে সেনাপতি বাদলও বেঁচে থাকার সুযোগ পেয়েছে। মূল কাব্যে উপসংহারে দেশের জন্য বাদলকে শহীদ হবার গৌরব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অনুবাদে গোরা নিহত হলেও বাদলকে বাঁচিয়ে রাখা হয় জীবন উপভোগের জন্য। ইতিহাসে রত্নসেনের পুত্রদের কোন পরিচয় নেই। জায়সীর কাব্যে পুত্ররূপে নাগসেন ও কমলসেনের উল্লেখ থাকলেও কবি তাঁদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করেননি। রত্নসেন ও পদ্মাবতীর প্রেমকাহিনীই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এঁদের মৃত্যুর পর সংক্ষেপে কবির ট্রাজিক অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে —

জৌহর ভঁই ইস্তিরী পুরুষ ভএ সংগ্রাম
বাদসাহ গঢ় চূরা চিতউর ভা ইসলাম।।[৭]

Dhaka University Institutional Repository

নারীরা সব জহরব্রত অনুষ্ঠান করলেন এবং পুরুষরা সংগ্রামে অবতীর্ণ হন, বাদশাহ দুর্গ চূর্ণ করলেন, চিতোর ইসলাম রাষ্ট্র হয়ে গেল।

কিন্তু বাঙালি কবি আলাওল এই ট্রাজিক পরিণতিতে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। রত্নসেনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র চন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনের পরিণতি কবিকে ভাবায়। এ জন্য কবি নিজের মত করে বর্ণনা করেছেন কাব্যের আরও একটি কাহিনী যেখানে বৈষ্ণবীয় প্রেমের আবহাওয়ায় সকল শত্রুতা ভুলে রত্নসেন আলাউদ্দীনের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেছেন। রত্নসেনের পুত্ররা পিতার মৃত্যুর পর বাদল সহ দিল্লি গিয়ে পিতার মৃত্যু সংবাদ বাদশাহর কাছে দিয়ে আত্মসমর্পণ করেছে। বাদশাহও সকল ঈর্ষা, অহংকার ও প্রতাপ ভুলে গিয়ে পরম আলিঙ্গনে রত্নসেনের পুত্রদের গ্রহণ করেছেন। অত:পর একজনকে চন্দেরী ও অন্যজনকে মাড়োয়া রাজ্য দান করেছেন। পরিশেষে কাব্যটি মিলনান্তক সমাপ্তি লাভ করেছে।

জায়সী সূফী প্রেম ভাবনা ও তত্ত্ব দর্শনকে কাব্যে উপজীব্য করলেও আলাওল কাব্যটিকে স্থানে স্থানে গ্রহণ বর্জনের মাধ্যমে রোমান্স রসকেই প্রাধান্য দিয়েছেন বেশি। কারণ আলাওলের পৃষ্ঠপোষক বর্গের রস ও রুচিবোধ। জায়সী- আলাওল দুজনই ছিলেন সূফী তত্ত্ব সাধক। জায়সী ছিলেন চিশতিয়া সম্প্রদায়ের এবং আলাওল ছিলেন কাদেরী সম্প্রদায়ভুক্ত। জায়সী ছিলেন সংসার ত্যাগী, মুক্ত স্বাধীন সিদ্ধ পুরুষ। তিনি ছিলেন অধ্যাত্ম প্রেম সাধক। আলাওল ছিলেন জীবন রসিক কবি। তিনি এই মর্ত্যেরই প্রেম সাধক। জায়সীর আধ্যাত্মিক প্রেম ভাবনা অপেক্ষা আলাওল এই মর্ত্যবাসীর জীবন রসকেই প্রাধান্য দিয়েছেন বেশি।

জায়সী তত্ত্বদর্শী এবং আলাওল জীবনরসিক। আলাওল সূফীসাধক হলেও জীবনবোধ সম্পর্কে ছিলেন আপোষহীন। আলাওলের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সমন্বয়বাদী। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে প্রেম ও মৈত্রীতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

জায়সী ও আলাওলের পদমাবৎ এবং পদ্মাবতী কাব্যের একটি মৌলিক পার্থক্য স্থানে স্থানে আলাওলের স্বাধীনতা গ্রহণ। যেমন– 'আরাকান রাজসভার' বর্ণনা, মধ্যযুগের অপর কোনো কবির কোনো কাব্যে আরাকান রাজসভায় সমবেত বিভিন্ন বিদেশের বণিকদের যে পরিচয় তা আন্তর্জাতিক বা Cosmopolitan. আবার সিংহল দ্বীপের বর্ণনায় আলাওল সিংহলের নয় বরং বাংলাদেশের প্রকৃতি ও নিসর্গ চিত্র অংকন করেছেন যা ঠেট হিন্দি ভাষায় রচিত মালিক মুহাম্মদ জায়সীর কাব্যে নেই। জায়সীর কাব্যে সুফি বা আধ্যাত্মিক রূপক প্রত্যক্ষ কিন্তু আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যে তা প্রচ্ছন্ন। আলাওল কাব্যের বিশেষ বিশেষ স্থানে নিজের পাণ্ডিত্বের যে পরিচয় দিয়েছেন তা মূল কাব্যে নেই। পরে এ বিষয়ে আরো বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জি

১। গোপাল হালদার, বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা (১ম খন্ড) (প্রাচীন ও মধ্যযুগ), মুক্তধারা, ১৯৮৬ (৩য় প্রকাশ), পৃষ্ঠা ৪৯-৫০।

২। দেবনাথ বন্দোপাধ্যায় (সম্পাদনা), *পদ্মাবতী* (দ্বিতীয় খন্ড), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা–২০।

৩। ওয়াকিল আহমদ, বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, (৫ম সংস্করণ), ঢাকা–২০০১, পৃষ্ঠা ২৬৭–২৬৮।

৪। দেবনাথ বন্দোপাধ্যায় (সম্পাদনা), *পদ্মাবতী* (দ্বিতীয় খন্ড), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা–২১।

৫। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২১।

৬। ওয়াকিল আহমদ, বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, (৫ম সংস্করণ), ঢাকা–২০০১, পৃষ্ঠা ২৭৮।

৭। দেবনাথ বন্দোপাধ্যায় (সম্পাদনা), *পদ্মাবতী* (দ্বিতীয় খন্ড), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা–৮।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্য (চর্যাপদ, রামায়ণ, মহাভারত ও মঙ্গল কাব্যের সমাজ ও সংস্কৃতি)

Dhaka University Institutional Repository

পদ্মাবতী কাব্যের সমাজ ও সংস্কৃতি বর্ণনা প্রসঙ্গে আমরা প্রাচীন ও মধ্যযুগের চর্যাপদ, রামায়ণ, মহাভারত এবং মঙ্গলকাব্যের সমাজ সংস্কৃতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

চর্যাপদ যে সময়ে রচিত অর্থাৎ (খ্রিষ্টীয় দশম হতে দ্বাদশ) এই দু'শ বছর বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি ঘটনাবহুল সন্ধিক্ষণ। এই সময়ে পতন হয়েছে পাল বংশের আর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেন বর্মণ বংশের। সেন রাজত্বের পতনের সাথে সাথে মুছে গেছে বাঙালি হিন্দু রাজত্বের গৌরবময় অধ্যায়। একদিকে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, আধিপত্যের উগ্র আকাঙ্ক্ষা, ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি, সামাজিক আদর্শ ও ভাবধারার প্রসার অন্যদিকে আর্যপূর্ব সংস্কৃতি ও সমাজ চিন্তার জীবন বিন্যাস ও জীবনাদর্শের প্রতিশোধ প্রচেষ্টা। দরিদ্রতা, অভাব, অনটন, অত্যাচার শোষণ, পীড়ন, অন্যদিকে বিলাস বহুল জীবন যাপন কামচর্চা ও কাব্যানুশীলন। একদিকে জ্ঞান সাধনা ও ধর্ম সাধনা কঠোর চরিত্রানুশীলন; অন্যদিকে বিশ্বাসের অভাব, মনোজগতে নৈরাজ্যের আবহাওয়া, মানবতাবোধে অবিশ্বাস সব নিয়ে উত্তাল তরঙ্গ বিশিষ্ট সমুদ্রের মতোই এ দুশ বছরের ইতিহাসে সন্নিবেশিত হয়েছে।

অনেক মনীষীর ধারণা চর্যাপদে নগর জীবনের কথা আছে। এই নগর বন্দর নগর। চর্যাপদের পদকর্তাদের অনেকে ছিলেন উচ্চপদ ও উচ্চ বর্ণের অধিকারী। আর্যদের স্বয়ং রাজাও ছিলেন। সুতরাং এখানে নগর জীবনের অভিজ্ঞতা ও জীবন বাস্তবতা থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু চর্যাপদে আমরা যে জীবন বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করি সেখানে অন্ত্যজ ও অবহেলিত শ্রেণীর কথাই বেশি বর্ণিত আছে। তাদের জীবন যাত্রার ধরন ও প্রকৃতি নির্মম ও নিষ্ঠুর। এই অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য সমাজের মানুষের জীবনযাত্রা ও সমাজে তাদের অবস্থান সম্পর্কে চর্যাগুলিতে পদকর্তাগণ অত্যন্ত স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

ড. অরবিন্দু পোদ্দার কয়েকটি চর্যা ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন যে, এর বাইরে অন্য এটা অর্থ পাওয়া গেলেও রূপকের অন্তরালে অন্ত্যজ জীবনের প্রতিচ্ছবিই প্রকাশ পেয়েছে।

অস্পৃশ্যডোম্বীকে বাস করতে হয় নগরের বাইরে একটি কুঁড়ে ঘরে। শবরী বালিকারও বাস নগরের মধ্যে নয় পার্বত্য অঞ্চলে টিলার উপর যেখানে সমতলের তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষের যাতায়াত নেই। সবচেয়ে সকরুন চিত্রটি পাওয়া যায় ৩৩ সংখ্যক পদে। নগরের এমন একটি অংশে তার বাস যেখানে কোন প্রতিবেশী নেই। সে অত্যন্ত দরিদ্র কিন্তু লোকের আনাগোনার কমতি ছিল না বাড়িতে। সবদিনে তার হাড়িতে ভাত থাকে না। সে জন্য কারো সহানুভূতি নেই, বরং তার সেই দরিদ্রতার সুযোগে লম্পট প্রেমিকের নিত্য ভিড় জমে বাড়িতে। নিম্ন সম্প্রদায়ের উপর তথাকথিত উচ্চ সম্প্রদায়ের অত্যাচার এখানে প্রকাশ পেয়েছে।

"আলো ডোম্বী তোএ সম করিব মো সাঙ্গ।"[১]

ব্রাহ্মণ বা উচ্চ সম্প্রদায়ের লোকেরা অনৈতিক কাজে যে লিপ্ত ছিল তার বাস্তব চিত্র উপরের আহবানে প্রতিফলিত হয়েছে। ডোম্বীকে বিবাহ করা ছিল সমাজ বিগর্হিত কাজ কিন্তু ডোম্বীর সাথে সঙ্গম বা সমাজ বহির্ভূত কাজে কোন অপরাধ ছিল না। এই হচ্ছে তৎকালীন সমাজের বাস্তব চিত্র।

চর্যাপদে বর্ণিত সমাজে বেশিরভাগ লোকই ছিল ভণ্ড ও ধূর্ত। যে যত ভণ্ড সে তত বলবান। অত্যাচার, উৎপীড়ন, অন্যায়, অবিচার দ্বারা অন্যায়ভাবে মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলা হত। চর্যাগীতিতে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়—

জো সো বুধী সোহি নিবুধী।
জো সো চোর সোহি সাধী।।
নিতি নিতি সিআলা সিহে সম জুঝই।।[২]

Dhaka University Institutional Repository

চর্যাপদ যখন রচিত হয় তখন সমাজে চোর ডাকাতের উপদ্রব ছিল। "কানেট চোরে নিল কাগই মাগই।"[৩] এ স্পষ্ট উক্তি তো আছেই তাছাড়া ৩৩ এবং ৩৮ সংখ্যক চর্যায় চোর ডাকাতের উল্লেখ আছে।

নৈতিকতাবোধ তখন সমাজে ছিল না বললেই চলে। নৈতিক অবক্ষয় সমাজে চরম অবক্ষয়ের সৃষ্টি করেছিল। গৃহস্থ বধূ রাতে কাম নিবৃত্তির জন্য অভিসারে বের হত।

সমাজে বিভিন্ন বৃত্তির নারী ও পুরুষের আনাগোনা ছিল। নাগরালী, কামচন্ডালী, ছিনালী, পতিতা, লম্পট প্রভৃতি রূপক চর্যাপদে একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে যা নিঃসন্দেহে তৎকালীন সমাজে বর্ণিত নৈতিক অবক্ষয়ের চিত্র।

সমাজের এই অসঙ্গতি, নৈতিক অবক্ষয় ও অধঃপতনের আর একটি চিত্র কুক্কুরীপাদের চর্যাতে পেয়ে থাকি —

দিবসে বহুড়ী কাগ ডরে ভা অ।
রাতি ভইলে কামরু জা অ।।[৪]

দিনের বেলায় যে বউটি কাকের ডাকেই ভয় পায় সে রাতে কামবাসনায় কোথায় চলে যায়। ঘরে শাশুড়ি ঘুমিয়ে থাকে আর বউ থাকে জেগে। এ সুযোগে শাশুড়ির চোখকে ফাঁকি দিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে কাম নিবৃত্তির জন্য। অসতী কুলবধূও যে তখন সমাজে ছিল এ চিত্র হতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

নৈতিক অধঃপতনের আর একটি চিত্র হিসেবে সমাজে মদ বিক্রির প্রচলন দেখতে পাই। ৩ সংখ্যক চর্যায় মদ বিক্রির উল্লেখ আছে—

দশমি দুআরত চিহ্ন দেখিআ।
আইল গরাহক আপণে বহিআ।।
চউশঠী ঘড়িযে দেউ পসারা।
পইঠেল গরাহক নাহি নিসারা।।[৫]

Dhaka University Institutional Repository

তারা নিজের বাড়িতে মদ তৈরি করত উপাদান হিসেবে ব্যবহার করত চিকণঃ বাকল এ কঙ্গুচিনা।

সেকালে নৃত্যগীত এবং অভিনয় কলার চর্চা হত। বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র যেমন একতারা, হেরুক, বীণা, ডমরু, ডমরুলি, বাঁশি, মাদল, পটহ ইত্যাদির উল্লেখ আছে। চর্যাগীতিকাগুলি রাগ রাগিনী এবং বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে গীত হত। সমাজের নিম্ন স্তরের লোক বোধ হয় নাচ গান করে জীবিকা অর্জন করত। ডোম্বীরা নাচে গানে খুব পারদর্শী ছিল—

এক সো পদমা চউসটঠী পাখুড়ী।
তহিঁ চড়ি নাচই ডোম্বী বাপুড়ী।।[৬]

লোকায়ত সমাজে নানা ক্রিয়াকর্ম যেমন– বিবাহ, আচার অনুষ্ঠান পালন করার রীতি ছিল। আজকের দিনের মত সে যুগেও বর ধুমধামের সাথে বাদ্য যন্ত্র বাজিয়ে বিবাহ করতে যেত। কাহ্নপাদের চর্যায় বিবাহ যাত্রার চমৎকার বর্ণনা আছে—

ভব নিববাণে পড়হ মাদলা।
মন পবণ বেণি করঙ কশালা।।
জঅ জঅ দুন্দুহি সাদ উছলিআঁ।
কাহ্ন ডোম্বী বিবাহে চালিআ।।
ডোম্বী বিবাহিআ আহরিউ জাম।
জউতুকে কিঅ অণুত্তর ধাম।।[৭]

ঐ সময়ে সমাজে যে যৌতুক প্রথার প্রচলন ছিল তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যৌতুকের লোভে নিম্ন সম্প্রদায় থেকে মেয়ে বিয়ের প্রচলন ছিল। বাসর রাতে বর বধূকে বুকে নিয়ে তিন ধাতু নির্মিত খাটে মেয়েদের ভিড়ে রাত কাটাত। বরকে কর্পূর দিয়ে পান খেতে দেয়া হত।

তৎকালীন বাঙালি ঘরোয়া জীবনের পরিচয় চর্যাগীতিকায় পাওয়া যায়। বধূরা শ্বশুর-শাশুড়ী-ননদকে নিয়ে একসঙ্গে বসবাস করত। হাঁড়িতে ভাত

Dhaka University Institutional Repository

না থাকাটাই সংসারে চরম বিপর্যয় আনে এ থেকে মনে হয় ভাত তাদের প্রিয় খাবার ছিল। হরিণ শিকারের উল্লেখ থেকে বুঝা যায় হরিণের মাংস তাদের প্রিয় ছিল। উচ্চবর্গের ব্রাহ্মণরা মাংসাশী ছিলেন না এটাই বেশি যুক্তিসঙ্গত কারণ চর্যাগীতিতে অন্ত্যজ শ্রেণীর চিত্রই বেশি বর্ণিত হয়েছে। দুধের উল্লেখ একাধিক চর্যায় পাওয়া যায়। দুধ ভাত বাঙালির প্রিয় খাদ্য হিসেবে চিরদিনই বিবেচ্য ছিল।

বিভিন্ন বাসন পত্রের পরিচয় চর্যাগীতিতে পাওয়া যায়। পীঢ়া (দুধ দুইবার পাত্র বিশেষ), ঘড়ি, ঘড়ুলী, হাঁড়ি প্রভৃতি। অলঙ্কার ও প্রসাধন দ্রব্যের মধ্যে বাজন-নূপুর, কুণ্ডল, মুক্তাহার, কাঁকন, সোনা-রূপা, তেল আয়না প্রভৃতি। সংসারে নিত্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে-কুঠার, টাঙ্গি, পিঁড়ি, চাঙ্গারি, পেটরা ইত্যাদি।

এছাড়াও চর্যাপদে আমরা সাঁকো নির্মাণ ও গৃহ নির্মাণের উল্লেখ পাই। ঘর সাধারণত বাঁশের চাঁচারি এবং খড় দ্বারা তৈরি হত। খড়ের ঘর আগুন লেগে পুড়ে যাবার কথা ৪৭ সংখ্যক পদে উল্লেখ আছে—

ডাহ-ডোম্বী ঘরে লাগেলি আগি।
সসহর লই সিঞ্চহু প্রাণী।।
নউ খড় জ্বালা ধূম ন দীসই।
মেরু-শিখর লই গঅণ পইসই।।[৮]

বিভিন্ন বৃত্তিজীবী মানুষের পরিচয় কয়েকটি পদে উল্লেখ আছে। নৌকা বাওয়া, হরিণ শিকার, মদ প্রস্তুত ও দস্যুবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কুঠার দ্বারা বৃক্ষ ছেদনের উল্লেখ আছে ৪৫ সংখ্যক চর্যায়, ইঁদুরের উপদ্রবের চিত্র পাওয়া যায় ২১ সংখ্যক চর্যায়। ইঁদুরের উপদ্রব হতে প্রমাণিত হয় সেকালে কৃষি হয়ত অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত হত। সামগ্রিক আলোচনার প্রেক্ষিতে চর্যাগীতিতে আমরা দেশ-কাল ও সমাজের নানাবিধ পরিচয় পাই যা অতীতকে জীবন্ত করে তোলে।

Dhaka University Institutional Repository

রামায়ণ ও মহাভারত বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের জাতীয় মহাকাব্য। অবতার কাহিনী নিয়ে রচিত হলেও রামায়ণ মহাভারতে আমরা গার্হস্থ্য জীবনের তথ্য পাই।

রামায়ণের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় "রামায়ণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহা ঘরের কথাকেই অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইয়াছে। পিতা-পুত্রে, ভ্রাতায়-ভ্রাতায়, স্বামী স্ত্রীতে যে ধর্মের বন্ধন,- যে প্রীতি ভক্তির সম্বন্ধ, রামায়ণ তাহাকে এত মহৎ করিয়া তুলিয়াছে যে, তা অতি সহজেই মহাকাব্যের উপযুক্ত হইয়াছে। রামায়ণের মহিমা রাম-রাবণের যুদ্ধকে আশ্রয় করিয়া নাই, সে যুদ্ধ ঘটনা রাম ও সীতার দাম্পত্য-প্রীতিকেই উজ্জ্বল করিয়া দেখাইবার উপলক্ষ্য মাত্র।"[৯]

রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য বাল্মীকির 'রামায়ণ' সম্বন্ধে তত সত্য নয়, যত সত্য চৈতন্যোত্তর যুগের 'বাংলা রামায়ণ' সম্বন্ধে; এবং এই মন্তব্য রচনার কালে কবির বাঙালি চেতনা বাংলা 'রামায়ণ' সম্বন্ধীয় সংস্কার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।"[১০]

মধ্যযুগের সামাজিক জীবনের পরিপূর্ণতা রামায়ণে পেয়ে থাকি। ভারতীয় সমাজের রীতিনীতি, সততা, সহনশীলতা, ধৈর্য প্রভৃতি গুণাবলীর বিকাশ রামায়ণে পরিলক্ষিত হয়। বাল্মীকির "রামায়ণ" ছিল মূলত রাজবৃত্তের কাহিনী এবং আর্য বিজয়ের ইতিহাস। এছাড়াও রামায়ণে লোকায়ত গার্হস্থ্য জীবন রসের উপাদানও ছিল প্রচুর। প্রধানত এই প্রাচুর্যের সুযোগ গ্রহণ করে বাংলার লোক চেতনা বাংলা রামায়ণের রচনাকালে মূল কাহিনীকে নব ভাবে, রসে সমৃদ্ধ করেছিল।

Dhaka University Institutional Repository

মহাভারত হচ্ছে ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদী ও সাধারণ জনসাধারণের জীবন দর্পণ স্বরূপ। কথায় বলে "যা নেই মহাভারতে তা নেই জগতে।"[১১] অশুভ শক্তির সাথে শুভ শক্তির দ্বন্দ্বই হচ্ছে মহাভারতের মূল কাহিনী। আর শুভ শক্তির জয়লাভের মধ্যেই এই কাব্যের সার্থকতা।

বাংলা রামায়ণ সাহিত্যে যেমন কৃত্তিবাস, "মহাভারত সাহিত্যে তেমন কাশীরাম দাস শুধু শ্রেষ্ঠই নন; বরং সামগ্রিক ঐতিহ্যের প্রতিভূ।"[১২] মহাভারত রাজসভার কাব্য হিসেবে পরিচিত ছিল কিন্তু কাশীদাসের প্রতিভা ও প্রবণতার গুণে কাব্যটি সাধারণ বাঙালির গৃহজীবন রস মাধুর্যে ভূষিত হয়েছিল। কবি বংশানুক্রমিকভাবে বৈষ্ণব ছিলেন। তাই চৈতন্য ঐতিহ্য সাধারণ ভাবেই তাঁর মধ্যে প্রবল ছিল; অন্যপক্ষে, "কাশীরাম দাসের আত্মায় নিহিত বৈষ্ণব–প্রাণতার শ্রেষ্ঠ বিকাশ তাঁর বৈষ্ণবোচিত বিনয়ে।"[১৩] কবি "চেতনার মূলগত চৈতন্যানুসারী প্রেম- শরণাগতির আদর্শ-প্রেরণাই রাজসভার কাব্য মহাভারতকে বাঙালির জীবন কাব্যে পরিণত করেছিল।"[১৪] সেই মহৎ রস সূত্রের অনুসরণে মহাভারতের উদাত্ত বীর্যগাথা কোমল স্নিগ্ধ প্রেমকথায় রূপান্তরিত হয়ে জাতির অন্তরকে প্রেম রসে সিক্ত করেছে।

মহাভারত পুরো ভারত বর্ষের ভূগোল, প্রকৃতি, জনজীবন, ন্যায়নীতি, রাজনীতি, বিশ্বাস, সংস্কার, জীবিকা পদ্ধতি, ধর্মার্থকাম, মোক্ষপন্থ, দ্বন্দ্ব মিলন ও প্রাণি জগৎ বিধৃত ও বিন্যস্ত গ্রন্থপঞ্জি।

মহাভারতের মূল কাহিনী কুরুপান্ডবের সম্পর্ক। এ কাব্যের মূল অংশ হচ্ছে কৌরব পাণ্ডবদের যুদ্ধ। কুরু ও পাণ্ডব বা পাঞ্চাল দুই পৃথক গোত্র নয়। পরস্পর জ্ঞাতি এবং দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার সন্তান ভরতের বংশধর। ভরতের রাজ্যই ভারত বর্ষ নামে আখ্যাত। রাম যেমন সূর্য বংশীয় কুরু ও পাণ্ডব তেমনি চন্দ্র বংশীয়।

Dhaka University Institutional Repository

"যা নেই মহাভারতে তা নেই জগতে"– তাই মহাভারত সামগ্রিক জীবন দর্শন। এই গ্রন্থে রাজনীতি, শাসন নীতি, কূটনীতি, ষড়যন্ত্র, প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা, সন্ধি, যুদ্ধ, হিংসা, বিদ্বেষ, লোভ, লালসা, প্রতিহিংসা ছল, চাতুরী প্রেমপ্রীতি, হতাশা, ব্যর্থতা, অসূয়া, ক্ষমা, ত্যাগ, তিতিক্ষা, ন্যায় নীতি, বিচার বিবেচনা, বিবেক বুদ্ধি, নারী হরণ, যৌন চর্চা, চুরি, দস্যুবৃত্তি, জয়ের উল্লাস ও পরাজয়ের গ্লানি, মহত্ত্ব, সততা, সত্যবাদিতা, বিনয়, ঔদ্ধত্য প্রভৃতি দোষ গুণের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও তথ্যের বিচার বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের রূপরেখা। এই গ্রন্থ সর্বকালের, সর্বজাতির ভাব চিন্তা কর্ম ও আচরণের দলিলপত্র। তাছাড়াও উক্ত গ্রন্থে আছে মানুষের ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, জীবন চেতনা ও জগৎ ভাবনার তাত্ত্বিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যা। একটি জাতির অন্তর ও বহিঃজীবনের স্রোত ধারা যদি কোন গ্রন্থে প্রবাহিত হয় তা নিঃসন্দেহে মহাভারতে।

মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে বিশেষ স্থান দখল করে আছে মঙ্গলকাব্য। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে মঙ্গলকাব্য ধারা মিশে আছে ওতপ্রোতভাবে। মঙ্গলকাব্যে বাঙালি সমাজের নিজস্ব কাহিনী ও জীবন দর্শন অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

একথা সত্য যে, মঙ্গল কাব্যের সাংস্কৃতিক পরিবেশ একান্তভাবেই সজীব। এখানে যে জীবন প্রবাহিত তা বিচিত্র ধারায়, বিভিন্ন কর্ম ও আচরণের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এখানকার জীবন নগর জীবন থেকে স্বতন্ত্র। আর এ জন্যই মঙ্গল কাব্যের সাংস্কৃতিক রূপটাও পৃথক। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে নগর সভ্যতার যে পত্তন দেখি তা সম্প্রীতি ও সহাবস্তানের সভ্যতা। মধ্যযুগে নগর সভ্যতার যে পরিচয় আমরা পাই সে সভ্যতা থেকে মঙ্গলকাব্যের সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক ভাবাকাশ সম্পূর্ণ পৃথক। রাজপ্রাসাদ ও রাজধানীর চাকচিক্যময় জীবনের বাইরে দেশময় প্রসারিত নিরাভরণ ও সজ্জাহীন জীবনই মঙ্গলকাব্যে লক্ষ্য করি। নাগরিক শ্রেয়বোধের স্পর্শ থেকে মুক্ত যে জীবন তাই মঙ্গলকাব্যে অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই এ

Dhaka University Institutional Repository

জীবনে নেই কোন সাজসজ্জা নেই কোন চাকচিক্য। অত্যন্ত সহজ ও চিরাভরণ জীবনই মঙ্গল কাব্যের প্রাণ। এ জন্যই মঙ্গল কাব্যগুলি সেকালে অজস্র মানুষের অব্যক্ত আকুতিকে ভাষা দিয়ে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছিল, অর্জন করেছিল জাতীয় সাহিত্যের মর্যাদা। সে জন্যই বাংলা কাব্য সাহিত্যের বিকাশে মঙ্গলকাব্যগুলি এক নতুন যুগের, নতুন সংস্কৃতির দ্যোতক।

আবহমান বাঙালি সমাজের বাস্তব চিত্র আমরা মঙ্গল কাব্যে প্রত্যক্ষ করি। *মনসামঙ্গল* কাব্যে আমরা লক্ষ্য করি চাঁদ সদাগর দেবীর (মনসার) সন্তুষ্টি বিধানে আগ্রহী ছিলেন না বলে হারাতে হয়েছিল ছয়পুত্র সন্তান এবং চৌদ্দ ডিঙা।

মনসামঙ্গল কাব্যে বেহুলার সতীত্ব প্রকাশ পেয়েছে। বেহুলা একাধারে রামায়ণের সীতা ও মহাভারতের সাবিত্রী। মানবিক অনুভূতির মূর্ত প্রতীক বেহুলা। বণিক সদাগরের জীবন চিত্র ও এখানে প্রতিফলিত। "মনসামঙ্গল" কাব্যে বিভিন্ন বৃত্তিজীবী মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন কাঠুরিয়া, কুমার, নাপিত, ধোপা, তাঁতী, জেলে, কৃষক, দৈবজ্ঞ প্রভৃতি। এরা স্ব স্ব কর্মে নিয়োজিত থেকে সামাজিক কর্মকাণ্ডে অবদান রাখে। এছাড়া অভিজাত এবং প্রশাসনের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তির পরিচয় ও *মনসামঙ্গল* বা পদ্মাপুরাণ কাব্যে পেয়ে থাকি। জনৈক চৌকিদার লঙ্কারাজ চন্দ্রকেতু সম্পর্কে চান্দো সওদাগরের কাছে যে বিবরণ তুলে ধরে তাতে আদর্শ রাজার গুণাবলী প্রকাশ পায়—

চৌকিদারে বোলে তবে শুন সদাগর।
চন্দ্রকেতু রাজা এদেশের নৃপবর।।
খেত্রিবংশে জন্ম রাজা বড় পূণ্যবন্ত।
জত সৎকর্ম করে নাহি তার অন্ত।।
ধনে বড় ধনী রাজা দানে বড় দাতা।
পুত্রবৎ পালে লোকে কি কহিব কথা।।[১৫]

Dhaka University Institutional Repository

পদ্মাপুরাণ কাব্যে আমরা নিম্ন নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের পরিচয় বেশি পাই। যাদের বেশীর ভাগ মানবেতর জীবন যাপন করে থাকে। দরিদ্রের বেত্রাঘাত তাদের সব সময় ব্যথিত করে। কোন রকম খেয়ে পরে জীবন ধারণ করা ও তাদের পক্ষে সুঃসাধ্য। তাদের অধিকাংশই বাস করে পর্ণ কুটিরে। পরিধেয় বস্ত্র বলতে তারা কৌপীনকেই বুঝে। কেউ আবার কাপড়ের ছেড়া টুকরো পরে থাকে। ঘরের মেঝেতে ছালা পেতে তারা শয়ন করে। ভিক্ষা বৃক্তি করেও অনেকে জীবন নির্বাহ করে। এই হচ্ছে *পদ্মাপুরাণ* কাব্যে নিম্ন নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন যাত্রার চিত্র। মৎস্যজীবী জেলে ও কৈবর্তরা নদীর কূলে কুঁড়ে ঘরে বাস করত। ক্ষুধার অন্ন এরা নিয়মিত জোটাতে পারে না। কৈবর্ত নারীরা বস্ত্রের অভাবে ছিন্ন বস্ত্রের টুকরো পরত। পদ্মাপুরাণ কাব্যে আমরা কিছু সামাজিক আচার আচরণ ও সংস্কার প্রত্যক্ষ করি। গুরুজনদের সাষ্টংগে প্রণাম করার নিয়ম সমাজে প্রচলিত ছিল। পুনর্জীবন প্রাপ্তির পর লক্ষীন্দরের ছয় সহোদর এবং ধন্বন্তরি ওঝা কৃতজ্ঞ চিত্তে পদ্মাদেবীকে প্রণাম করেছিল—

ছয় সহোদর আর ওঝা ধন্বন্তরি।
দেবীরে প্রণাম করে ভূমি তলেপড়ি।।[১৬]

দেবীর প্রসাদ গ্রহণ কালে হাত জোড় করে নেয়ার প্রচলন তখনও ছিল বর্তমানেও এ নিয়ম প্রচলিত আছে—

"প্রসাদ লইল তারা জোড় হস্ত করি।"[১৭]

বিবাহ যাত্রাকালে গুরুজনদের প্রণাম করার নিয়ম সর্ব সময় প্রযোজ্য। লক্ষীন্দর বিবাহে যাত্রাকালে তাঁর মাকে চরণ ছুঁয়ে প্রণাম করেছিল—

যাত্রা করি বন্দে আগে মায়ের চরণ।
তাহার শেষে একে একে বন্দে গুরুজন।।[১৮]

সমাজে উচ্চবিত্তের সভাগৃহে বা রাজসভায় কিছু আচার পার্বণ সম্পর্কে ধারণা পাই শ্রীরায় বিনোদ এর কাব্যে। চাঁদ সদাগরের সভাগৃহে নিম্নোক্ত আচার পার্বণ পালিত হত—

Dhaka University Institutional Repository

রজনী প্রভাতে চান্দো নিত্যকর্ম করি।
দেওয়ানশালাত বৈসে চম্পক-অধিকারী।।
পাত্র মিত্রগণ গেলা রাজার বিদিত।
বেদহস্তে আশীর্বাদ করে পুরোহিত।।
গণকে পড়িল পাঁজি চান্দোর বিদিত।
নাপিত দর্পণ দিয়া হৈল এক ভিত।।
গন্ধ দিয়া গন্ধী ভেটে মালা দিয়া মালী।
ভাটে আশীর্বাদ কৈল উর্ধ্ববাহু করি।।[১৯]

এছাড়াও অতিথি সেবা, নিমন্ত্রণ পদ্ধতি, যাত্রার শুভাশুভ নির্ণয়, নিয়তিবাদ, কর্মফল ও অদৃষ্টবাদে বিশ্বাস এর প্রতিফলন শ্রীরায় বিনোদ-এর কাব্যে পেয়ে থাকি। তাম্বুল সহযোগে নিমন্ত্রণ করার প্রচলন ছিল। যাত্রার সময় শুভ লক্ষণ মানা হত। ইন্দ্রসভায় নাচতে গিয়ে উষা-অনিরুদ্ধ নিম্নোক্ত অশুভ লক্ষণ দেখেছিল—

ঊষা বোলে নৃত্যে আজি মোর নাহি সাধ।
প্রভাতে উঠিতে হাঁচি মোর পড়িয়াছে আজি
নৃত্যে আজ দেখি পরমাদ।।
.....
বাম চক্ষু মোর চলে বাম ভুজ উপরে
গাও ওঠে চমকি চমকি।
শুনিয়া নৃত্যের কথা বড় হৈল মনোব্যথা
নৃত্যে আজি শুভ নহে দেখি।।[২০]

জ্যোতিষশাস্ত্রের উল্লেখ মধ্যযুগের অনেক কাব্যেই পাওয়া যায়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ভাগ্য গণনার জন্য জ্যোতিষীর আগমন ঘটে। নবজাতকের কোষ্ঠি গণনা এবং শুভক্ষণ ও জন্ম পত্রিকা প্রস্তুত করা জ্যোতিষী বা দৈবজ্ঞের পেশা ছিল। পদ্মা, লক্ষ্মীন্দর ও বিপুলার জন্মের পর গণক ডাকা হয়েছিল–

Dhaka University Institutional Repository

(ক) আষাঢ়ী মঙ্গলবার পঞ্চমী তিথি।
শুভক্ষণে শুভলগ্নে জন্মিলা পদ্মাবতী।।
দুই সমুচিত তবে চান্দেত হৈল হোরা।
সপ্তম ঘরে শুক্র নিধন ঘরে খোঁড়া।।
জত ইতি শুভযোগ লগ্নে উপস্থিত।
পতিত্যাগ যোগমাত্র মেহি সে কুশ্চিত।[২১]

(খ) শুভ লগ্নে জন্মিল বালা লক্ষীন্দর।
রবি ভূম গুরু কেন্দ্রী শনি মৃত্যুঘর।।
লগ্নের পঞ্চম ঘরে দেখে সুধাকর।
শুভকালে সবে মিলি কর এ মঙ্গল।।
চিরজীবী সুলক্ষণ জ্যোতিষিরা বোলে।
নাড়ীচ্ছেদ করি সোনা পুত্র লৈল কোলে।।[২২]

(গ) শুক্র শশী সুর গুরু লগ্নে সব দেখে।
সব শুভক্ষণ হৈছে কহিল গণকে।।[২৩]

গুরুর প্রতি শিষ্যদের অপরিসীম ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল। শঙ্খওঝাকে তার শিষ্যরা খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করত। শিষ্যদের সামনে কেউ শঙ্খওঝাকে নিন্দা করলে শিষ্যরা সহ্য করত না–

শিষ্য বোলে গুরু দেখি নাগ পলাও ডরে।
নাগের শকতি তানে কি করিতে পারে।।
কোন গর্বে গোয়ালিনী দিলা এত গালি।
তোর জাতির ধর্ম হের আইস বুলি।।[২৪]

শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন সে যুগে খুব বেশি না থাকলেও মধ্যবিত্ত কিংবা উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তানদের বয়স চার পাঁচ বছর পূর্ণ হলে "হাতেখড়ি অনুষ্ঠান" হত। ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ন্যায়, কাব্য, নাটক, সঙ্গীত, গণিত, জ্যোর্তিবিদ্যা ও শাস্ত্রশিক্ষার সঙ্গে রতিশাস্ত্রও কখনও কখনও কোথাও শিক্ষা দেয়া হত"।[২৫]

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীরায় বিনোদের পদ্মাপুরাণ কাব্যে লক্ষ্য করা যায় যে, লক্ষ্মীন্দরের বয়স যখন পাঁচ বছর তখন "হাতে খড়ি" দেয়া হলো। লক্ষ্মীন্দর সকল শাস্ত্রই পাঠ করেছিল–

মনসার বরে লখাই বারে দিনে দিনে।
পঞ্চ বরিষের হৈল জেন পঞ্চবাণে।।
খড়ি হাতেত দিল পড়ে গুরুর স্থানে।
পড়িল সকল শাস্ত্র চান্দোর নন্দনে।
সাত বৎসরে লখাই হৈল বিচক্ষণ।।[২৬]

ধর্ম শিক্ষা সে যুগে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। পণ্ডিতের ঘরে টোলে গিয়ে ছাত্ররা বেদাদি চর্চা করত।

বাল্যবিবাহ সমাজে প্রচলিত ছিল। বয়সের নির্দিষ্ট কোন উল্লেখ কাব্যে না থাকলেও শ্রীরায় বিনোদনের কাব্যে বিবাহের বয়স দৃষ্টে মনে হয় বার বছর বয়সই ছিল বিবাহের উৎকৃষ্ট সময়। লক্ষ্মীন্দরের বার বছর বয়স হলেই চান্দো সওদাগরের ছেলের বিবাহের উদ্যোগ গ্রহণ এ সত্যতার প্রমাণ দেয়–

শৃঙ্গী পণ্ডিত বোলে শুন সদাগর।
আর এক কন্যা আছে উজানিনগর।।
সাহে নামেত রাজা রাজ্যের ঈশ্বর।
পরম সুন্দরী কন্যা আছে তার ঘর।।
বারয় বৎসরের কন্যা প্রথম যৌবন।
তার সম রূপবতী নাহি ত্রিভুবন।।
শুনিয়া হাসিল তবে রাজা চন্দ্রধর।
সেহি কন্যা বিবাহ করিবে লক্ষ্মীন্দর।[২৭]

পদ্মাপুরাণ কাব্যে বিবাহ অনুষ্ঠানের যে বর্ণনা আছে সেখানে হিন্দু বিবাহ রীতির একটি নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। বরসজ্জা, বরানুগমন, বরবরণ, কন্যা সজ্জা, ঘর সজ্জা প্রভৃতি বর্ণনায় হিন্দু বিবাহরীতির ইঙ্গিত আছে– (লক্ষ্মীন্দরের বরসজ্জা)

Dhaka University Institutional Repository

বিচিত্র বসন বালা কৌতুকে পরিল।।
রতন ভূষণ বালা প্রতি অঙ্গে পরে।
হেমমণি মুকুট তুলিয়া দিল শিরে।।
পুষ্পঝরা শিরে পরে করে ঝলমল।
চন্দনে চর্চিত বালা কৈল কলেবরে।।
যূথী জাতি মালা পরে কণ্ঠের উপর।
শ্রবণেত দোলএ মণিময় কুণ্ডল।।[২৮]

শ্রীরায় বিনোদনের কাব্যে বর বরণে দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। প্রথম পর্যায়ে পুরুষেরা ধর্মাশাস্ত্রানুযায়ী এবং দ্বিতীয় পর্বে এয়োরা স্ত্রী আচার নিয়মে বরকে বরণ করে।

বিয়ের পূর্বে বর কনের অধিবাস অনুষ্ঠান বিবাহের আর একটি গুরুত্ব পূর্ণ অঙ্গ। সাধারণত গোধূলীলগ্নই ছিল অধিবাসের উৎকৃষ্ট সময় :

স্নানান্তে লক্ষ্মীন্দরের নতুন বস্ত্র পরিধানের পর—

কুল পুরোহিত আইল শৃঙ্গী দ্বিজবর।
অধিবাস আরম্ভিল করিয়া মঙ্গল।।
পূর্ণঘট স্থাপে শ্বেত-ধান্যের উপর।
আম্রপল্লব দিল যাত্রা-মঙ্গল।।
বেদবিহিত যজ্ঞ করিল একে একে।
লখাইর অধিবাস করিল কৌতুকে।।
জয়জোকার দিল জত নারীগণ।
নানা বাদ্য হুলস্থুলি পুরিল ভুবন।।[২৯]

একই নিয়মে বিপুলার অধিবাস অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

বিবাহ অনুষ্ঠানে নাচগান এবং বাদ্য বাজনার বহুল প্রচলন ছিল (লক্ষ্মীন্দরের বিয়েতে)

চম্পক নগরে হৈল রাজ্যের কোলাহলো।
দুন্দুভি ডগর বাজে ঝাঁজর মাদল।।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাক ঢোল কাড়াপড়া শঙ্খকরতাল ।
সানাই লক্ষুরি বাজে ভেউর কর্ণাল ।।
আর জত বাদ্য বাজে সংখ্যা নাহি তার ।
সহস্র বাজন বাজে রাজার দুয়ার ।।[৩০]

বরযাত্রী নিয়ে নৃত্যগীতে গমনের দৃশ্যটি অতি মনোরম–

নৃত্যগীতে জাএ চান্দো করি হুলস্থুলি ।[৩১]

"সেকালে বরযাত্রীকে কনে পক্ষের লোকেরা পথে ঠেঁকিয়ে ছন্দ বাধা সৃষ্টি করত এবং অর্থাদি ঘুষ নিয়ে ছেড়ে দিত" ।[৩২]

বিয়েতে এয়োদের আমন্ত্রণ করার নিয়ম সব সময় সমাজে প্রচলিত ছিল। কিন্তু কুসংস্কারবশত তৎকালে বিয়েতে বিধবা বর্জন অনেক কাব্যে দেখা যায়। বিপুলার বিয়েতে এয়োদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল–

আইওগণ আনিতে পাঠাইল অনুচরী ।
আইওগণ আসিয়া করিল জয়ধ্বনি ।।
আইওগণ আনিয়া দিল তৈল সিন্দূর ।[৩৩]

পদ্মার বিবাহানুষ্ঠানেও এয়ো আমন্ত্রিত ছিল–

"বর স্নান করাইয়া গেল আইওগণ ।।"[৩৪]

বিবাহে দিন, ক্ষণ, তিথি লগ্ন মানা হত। বিবাহ সংগঠনে গোধূলী লগ্নই শুভক্ষণ বলে সমাজে ধারণা ছিল–

চান্দো বোলে শুন কহি সাহেব নন্দন ।
গোধূলী সময়ে বিহা অতি শুভক্ষণ ।।[৩৫]

গোধূলী লগ্ন বিয়ের উৎকৃষ্ট সময় এ ধারণা আজও আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে।

Dhaka University Institutional Repository

বিবাহানুষ্ঠানের মঞ্চ অত্যন্ত সুসজ্জিত করে তৈরি করা হত। চারদিকে চারটি কলা গাছ পোতা হত। চারপাশ ফুল ও রঙিন কাগজ দিয়ে সাজানো হত। জল পূর্ণ মঙ্গল ঘট কলসীর মুখে বসানো হত। ঘটের মুখে আমের ডালসহ (৩/৫টি পাতা) দেয়া হত। উপরে থাকত চাঁদোয়া। লক্ষ্মীন্দরের বিবাহানুষ্ঠানে দেখি–

সারি সারি কলা রুইল অতি বিলক্ষণ
পট্ট বস্ত্রে করিল মল্লিকা আরোপণ।[৩৬]

এই মঞ্চে বর কন্যার শুভ দৃষ্টি সম্পন্ন হত। বিবাহানুষ্ঠানের এই পর্বটি সবচেয়ে আকর্ষণীয়।

রতন আসনে তুলি ধরে লক্ষ্মীন্দর।
ধরিল রতন ছত্র মাথার উপর।।
বিপুলা সুন্দরী তবে চলিল সাজিয়া।
বরের সম্মুখে গেল অন্তস্পট দিয়া।।
অন্তস্পট দূরকরি করে নমস্কার।
সুদর্শন ফোঁটা দিল ললাট মাঝার।।
সোহাগ কাজল দিল তুলিয়া নয়ানে।
হাতের দর্পণ কন্যা দিল পতিস্থানে।।
বরের দর্পণ কন্যা আনে কুতূহলে।
লক্ষ্মীন্দরে দিল মালা বিপুলার গলে।।[৩৭]

শুভ দৃষ্টির পর সাত পাক অনুষ্ঠান শুরু হয়। এ পর্যায়ে কনে বরকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে। প্রতিবার চরণে ফুল দিয়ে নমস্কার করে। এ পর্বটিও খুব আকর্ষণীয়। বিবাহানুষ্ঠানে আগত অতিথিরা ফুল দিয়ে বর কনেকে স্বাগত জানাই। সাত পাক সমাপনান্তে মালা বদল পরে মঞ্চ থেকে বর কন্যাকে নামিয়ে বিয়ের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। বিবাহোত্তর কিছু স্ত্রী আচার পালন করার নিয়ম পরিলক্ষিত হয়—

Dhaka University Institutional Repository

(ক) আনন্দে হইল হুলস্থুল।

লক্ষীন্দরে করে বিহা ফুল মারে মেলাইয়া
সানন্দিত বিপুলা সুন্দরী।।
দিব্য মালা লৈয়া করে বিপুলার দিল গলে
পুষ্প মেলি মারে মুঠে মুঠে।।
পতি প্রদক্ষিণ করি করজোড়ে নমস্কারি
বিবিধ বিচিত্র ফল খোঁটে।।
পুনর্বার নমস্কার প্রদক্ষিণ সাতবার
ফুল খোঁটে সাহেব কুমারী।
কুতূহল লক্ষীন্দর ফুল মেলে নিরন্তর
ও না রঙ্গ কহিতে না পারি।।
লাজে হেঁট মাথা করি আড় আঁখি চাহে তুলি
পতি মুখ করে নিরীক্ষণ।[৩৮]

(খ) একে একে কুলাচার কৈল সব নারী।
বুকে পিঠে জোড়া পান আনি দিল বুড়ী।।[৩৯]

(গ) ধান-দূর্বা শিরে দিয়া আঘে নারীগণ।[৪০]

বিবাহানুষ্ঠানের আচার পার্বণ শেষে ভোজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ভোজন উৎসব সামর্থ্য অনুযায়ী আয়োজিত হয়।

কন্যা বিদায় শাশ্বত বাঙালি সমাজের একটি করুণ ও হৃদয় বিদরক দৃশ্য। পুরুষ প্রধান সমাজে নারী একান্তভাবেই পুরুষের উপর নির্ভরশীল। এ কারণেই উপযুক্ত পাত্রের হাতে পাত্রস্থ করার জন্য কন্যার পিতা ব্যাকুল। কন্যা বিদায়কালে বিপুলার পিতামাতা তাঁদের কন্যার প্রতিপালনের জন্য লক্ষীন্দরকে অনুরোধ জানায়—

শাশুড়ীর স্থানে গিয়া চান্দোর নন্দন।
কনক অঞ্জলি দিয়া বন্দিল চরণ।।
ভূমেত পড়িয়া বালা প্রণাম করিল।

Dhaka University Institutional Repository

কান্দিতে কান্দিতে রত্না আশীর্বাদ কৈল।।
রত্না বলে শুন বাপু সাধুর কুমার।
পালিবা দুহিতা মোর বনিতা তোমার।।
বিদায় হইয়া বালা শাশুড়ীর স্থানে।
শ্বশুর চরণ বালা বন্দিল তখনে।।
আলিঙ্গন দিয়া বোলে বিনয় বচন।
পালিও দুহিতা মোর এহি নিবেদন।।[৪১]

পরকে আপন, অনাত্মীয়কে আত্মীয় করার মহান ব্রত এবং পিতামাতার আশীর্বাদ নিয়ে বিপুলা শ্বশুর বাড়ির অভিমুখে যাত্রা করে। বিপুলার বিদায় ক্ষণে মায়ের বুক ফাটা আর্তনাদ–

রত্নাবতী দুঃখে কান্দে পড়ি ভূমিতল।
মোর পুরী শূন্য করি জাও পতিঘর।।
কিমতে রহিব ঘরে তোমা না দেখিয়া।
দুঃখে প্রাণ জাএ মোর বুক বিদরিয়া।।[৪২]

স্বামী সেবা সতী নারীর আরাধ্য ছিল। স্বামীর সর্বকার্যে সাহায্যকারী হিসেবে নারী (স্ত্রী) সেখানে অর্ধাঙ্গিনী হিসেবে বিবেচিত হত। "অবস্থা যতই প্রতিকূল হোক না কেন, একজন সতী স্ত্রী কখনই দ্বিচারিনী হতে সম্মত হত না।"[৪৩] চান্দোর রতি প্রার্থনায় ছদ্মবেশী পদ্মার উক্তি স্মরণীয়–

পাপ কর্ম মোরে না বুলিও অধিকারী।
কদাচিৎ নহি আমি দূরাচার নারী।।[৪৪]

সহমরণ প্রথা হিন্দু সমাজে বহুল প্রচলিত একটি কুসংস্কার ছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর চিতায় স্ত্রীর আত্মাহুতি দেয়ার উল্লেখ আমরা শ্রীরায় বিনোদের কাব্যে পাই। স্বেচ্ছায় বধূরা স্বামীর চিতায় প্রাণ দিত। ধর্মীয় প্রেরণা বশতঃই রমনীরা এ কাজটি করত–

"পতি-বিনে আর গতি নাহি নারীকূলে।"[৪৫]

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণত কাষ্ঠ দিয়ে চিতা সজ্জিত হত। উচ্চবিত্ত ও অভিজাত সম্প্রদায় অগরুচন্দন কাষ্ঠ দিয়ে চিতা সাজাত। তার সাথে ঘৃত যোগ করত।

সমাজে নারীর অবস্থান এবং শিক্ষা ব্যবস্থা প্রায় উপেক্ষিত ছিল। মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্তের ঘরের মেয়েরা প্রাথমিক শিক্ষা পেত কিন্তু উচ্চ শিক্ষা লাভের আগ্রহ সমাজে খুব বিরল ছিল।

সমাজ ও সংস্কৃতি বর্ণনার ক্ষেত্রে শ্রীরায় বিনোদের পদ্মাপুরাণ কাব্যে বহু উপকরণ দৃষ্টিগোচর হয়। নারীর সাজসজ্জা, অলঙকার, প্রসাধন, বসন, ভূষণ, যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধ বর্ণনা, যৌতুক দ্রব্য, উপহার ও পারিতোষিক সমাজে বিরাজকৃত অনাচার, অত্যাচার, গৃহ নির্মাণ সামগ্রী, বাদ্যযন্ত্র, তৈজসপত্র, খেলাধূলা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য সমাজ ও সংস্কৃতিতে প্রভাব ফেলে।

কবি মুকুন্দরাম তাঁর *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে ষোড়শ শতকের বাংলাদেশের যে সমাজ চিত্র অংকন করেছেন তা ঐতিহাসিকদের কাছে চিরকাল অমূল্য বিবেচিত হবে। কাব্যের প্রথমেই আত্মজীবনী অংশে কালকেতুর জন্ম, বাল্যকাল, বিবাহোৎসব, ভোজন, বিলাস, ফুল্লরার বারমাসী বর্ণনা গুজরাট নগরে প্রজা পত্তন, প্রজাদের জাতি ও ব্যবসাবৃত্তি, ধনপতির উপাখ্যান সর্বত্রই সমাজের বাস্তব চিত্র প্রকাশ পেয়েছে।

মুকুন্দরামের "চণ্ডীমঙ্গল" কাব্য রচনাকালে পাঠানশক্তি বাংলাদেশ হতে প্রায় উৎখাত হয়েছে। মোগল শক্তি তখনও তাদের আধিপত্য পুরোপুরি বিস্তার করতে পারেনি। দেশে তখন অরাজক অবস্থা বিরাজ করছে। জায়গীরদার তাদের অধিকার নিয়ে ব্যস্ত। গরীব প্রজার উপর অত্যাচারের স্টিমরোলার চলতে থাকে। ভূমির নতুন জরীপ ব্যবস্থা এবং খাজনার পরিমান বাড়তে লাগল।

Dhaka University Institutional Repository

"মঙ্গলকাব্যের সামাজিক পটভূমি অর্থাৎ বাংলার মধ্যযুগ নানা অসঙ্গতি বিশৃঙ্খলায় চিহ্নিত।"[৪৬] বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সমাজের অভ্যন্তরীণ গলদ, শ্রেণীগত বৈষম্য ও উৎপীড়ন।

সুদ ও বাট্টাভোগী মহাজনরা রীতিমত শক্তিশালী হয়ে দেশের অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করছে। "রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়, স্থায়ী সংহত জীবন বিন্যাসের অভাব ও সামাজিক অসঙ্গতির চাপে বৃহত্তর জনসমষ্টির জীবন নানা দিক থেকে অসহনীয় হয়ে উঠেছে। জীবনে কোন স্থিরতা নেই, সুখ অচিন্ত্যনীয়, শান্তি সুদূরপরাহত।"[৪৭]

মুকুন্দরাম কবি কঙ্কণ চণ্ডীতে আত্মপরিচয় সম্পর্কে বলেছেন—

সরকার হৈল কাল খীল ভূমি লিখে লাল
বিনি উপকারে খায় ধূতি।
পোতদার হৈল যম টাকা আড়াই আনা কম
পাই লভ্য খায় দিন প্রতি।।
জাঁদা রহে প্রতিনাছে প্রজারা পালায় পাছে
দুয়ার জাতিয়া দেই থানা।
প্রজাকার বিয়াকুলি বেচে ঘর কুটত্তালি
টাকাকের বস্তুদশ আনা।।[৪৮]

স্বয়ং কবিও মামুদ সরিপ নামক এক ডিহিদারের অত্যাচারে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এ অত্যাচার হতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কেউ অব্যাহতি পায়নি। কোনাকুনি হিসেবে জমির মাপ হতে লাগল। পতিত জমির উপর উর্বর জমির হিসেবে খাজনা আদায় করা হলো। টাকা ভাঙাতে গেলে পোদ্দারকে টাকা প্রতি আড়াই আনা বাটা প্রদান করতে হত আর ধার নিতে গেলে টাকা প্রতি এক পাই করে সুদ দিতে হত—

"পোদ্দার হৈল যম টাকা আড়াইআনা কম
পাইলভ্য খায় দিন প্রতি"।[৪৯]

Dhaka University Institutional Repository

মজুরী দিয়েও কাজ করার লোক পাওয়া যেত না। অস্থাবর সম্পত্তি ও ধান গম ক্রয় করার লোক ছিল না। এ অত্যাচার হতে রেহায় পেতে কেউ দেশ ত্যাগ করবে সে অবস্থাও ছিল না কারণ পোদ্দাররা তাদের উপর কড়া নজর রাখত।

সমাজে উচ্চবিত্ত এবং নিম্নবিত্তের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য প্রত্যক্ষ করা যায়। নিম্ন শ্রেণীর মানুষের দুঃখ কষ্টের সীমা ছিল না। তারা মানবেতর জীবন যাপন করত। ফুল্লরার বারমাসী বর্ণনার মধ্যে দরিদ্র শ্রেণীর জীবন যাত্রার চিত্রই ফুটে উঠেছে–

বৈশাখে অনল সম বসন্তের খরা।
তরুতল নাহি মোর করিতে পসরা।।
পায় পোড়ে খরতর রবির কিরণ।
শিরে দিতে নাহি আঁটে খুঞার বসন।।
নিযুক্ত করিল বিধি সভার কাপড়।
অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছড়।।[৫০]

প্রতিটি মাসই অভাবীদের জন্য বয়ে আনে চরম দুর্ভোগ ও বিপর্যয়। মুকুন্দরাম অতি চমৎকার ভাবে ফুল্লরার বারমাসী বর্ণনার মধ্য দিয়ে সমাজে অভাবী মানুষের চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। দরিদ্র নারীর সম্বল ছিল মাটির থালা ও বাসি পান্তা। তারা ধনীর গৃহে ধান ভানত। হাঁটে চরকা কাটত। সূতা বিক্রি করত, ছেড়া কাপড় ও খুঞা পরত এবং কুঁড়ে ঘরে বাস করত। এই ছিল গরীব ও হতদরিদ্র মানুষের সামাজিক অবস্থা।

দেশে ন্যায়পরায়ণতা ও ধর্মবোধের অভাব ছিল। মুরারী শীল আংটি নিয়ে অল্প দামে কালকেতুকে ঠকানোর চেষ্টা করে। কবি চমৎকার ভাবে তৎকালীন সমাজের ধূর্ত লোকের পরিচয় দিয়েছেন–

"সোনা রূপা নহে বাপ এ বেঙ্গা পিতল।
ঘসিয়া মাজিয়া বাপু কর্যাছ উজ্জ্বল।"[৫১]

Dhaka University Institutional Repository

এই উদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে ধূর্ত বণিকের গুপ্ত অভিপ্রায় প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। সে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ-এই ভাব প্রকাশ করার জন্যই কালকেতুকে এ বিষয়ে মুহূর্ত মাত্র ভাববার অবকাশ না দিয়ে তড়িৎ গতিতে আংটিটির হিসাব কষে ফেলল–

রতি প্রতি যদি হয় দশ গণ্ডা দর।
দুই ধানের কড়ি তায় পাঁচ গণ্ডা ধর।।
অষ্ট পণ পাঁচ গণ্ডা অঙ্গুরীর কড়ি।
মাংসের পিছিলা ধার ধারি দেড় কড়ি।।
একুণে হইল অষ্ট পণ আড়াই কড়ি।
চাল খুদ কিছু লহ কিছু লহ কড়ি।।[৫২]

কালকেতু গুজরাটে নতুন রাজ্য স্থাপন করল। যেখানে সমাজের অন্তর্গত কোন সম্প্রদায়কে অসম্মান বা অমর্যাদা করা হবে না; কোন অশুভ বা অকল্যাণ বুদ্ধি জয়যুক্ত হবে না। কালকেতু বুলান মণ্ডলকে বলছে–

শুন ভায়া বুলন মণ্ডল।
সন্তাপ কবির দূর আস্যই আমারপুর
কানে দিব কনক কুণ্ডল।।
মনে না ভাবিবে আন মূলে তোরে দিব ধান
গরু দিব লাঙ্গল বাহনে।
যার যেবা নাহি থাকে সেই ধন দিব তাকে
কোন চিন্তা না করিহ মনে।।
আমার নগরে বস জত হালে চাষ চষ
তিন সন বই দিবে কর
হালে হালে দিবে তঙ্কা কারে না করিবে শঙ্কা
পাট্যায় নিশান মোর ধর।।
নাহিক বাউরি ডেরি রয়্যা বস্যা দিহ কড়ি
ডিহিদারি নাহি দিব দেসে।
জত বেচ চাল ধান তার নাহি লব দান

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্ক নাহি বাড়াব বিশেষে।।

জত বৈসে দ্বিজবর তার নাহি লব কর

চাষ ভূমি বাড়ী দিব দান।

হৈয়া ব্রাহ্মণের দাস সভার পূরিব আস

জনে জনে করিব সম্মান।।[৫৩]

কোন সম্প্রদায় বা কোন ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে নয়, সবাইকে নিয়ে আদর্শ সমাজ গড়ে উঠবে। এখানে ন্যায় এবং কল্যাণধর্মীতার প্রতিষ্ঠা প্রত্যক্ষ করে দলে দলে সমাজের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, কায়স্থ, গোপ, ধীবর, মুসলমান এবং অন্যান্য সম্প্রদায় বসতি স্থাপন করল। চণ্ডীর আশীর্বাদে সমাজে যা কিছু অশুভ, অকল্যাণ ও কুৎসিত তা সমাজ হতে দূরীভূত হয়। সেখানে "দুঃখী দরিদ্র তাতে এক নাহি জানি। কনককলসী ভরি প্রজা খাএ পানী।"[৫৪] এভাবেই মানুষ বর্তমানের অপ্রাচুর্যকে ভবিষ্যতের ঐশ্বর্য দ্বারা পূর্ণ করে; বাস্তবকে অধ্যাস দ্বারা সৃষ্টি করে।

বেশভূষা ও অলঙ্কার ব্যবহারের মধ্যে সে সময়ের রুচি এবং উন্নত শিল্প বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। সম্ভ্রান্ত বাঙালিদের পোশাক ছিল "একখানি কাচিয়া পিন্ধে, আর একখান মাথায় বান্ধে, আর একখান দিল সর্ব গায়।"[৫৫] মেয়েরা পশ্চিমাদের মত কাঁচুলি পরতেন। বিশেষ করে কোন উৎসব পার্বণে এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। মেঘডুম্বর সহ নানা রকমারি শাড়ীর নাম পাওয়া যায়। নিম্নশ্রেণীর লোকের পরিধেয় বস্ত্র ছিল খুঞার বসন। শাখা ও স্বর্ণালঙ্কারের উল্লেখ আছে, সেই সঙ্গে ফুলের গহনার প্রতিও রমণীদের আকর্ষণ কম ছিল না।

পুরুষেরা নারীদের মত হাতে বলয় এবং কানে সোনার কুণ্ডল পরত। পুরুষের লম্বা চুল সৌন্দর্য বর্ধনের প্রতীক ছিল। "পরম সুন্দর লখাইর দীর্ঘ মাথার চুল, জ্ঞাতিগণ ধরি নিল গাঙ্গুড়ির কূল।"[৫৬] নগর জীবন সম্বন্ধে কবি কঙ্কণ মুকুন্দরাম লিখিয়াছেন– "নগরে নাগরজনা, কানে লম্বমান সোনা, বদনে গুবাক, হাতে পান, চন্দনে চর্চিল তনু, হেন দেখি যেন ভানু, তসর রঙ্গন পরিধান।"[৫৭] মেয়েরা ফুল দিয়ে বিভিন্ন আকৃতির কবরী বাঁধত।

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্যা চর্চা সাধারণত উচ্চবিত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। নারী শিক্ষার প্রচলন সমাজে তেমন ছিল না বললেই চলে। তবে কেউ কেউ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করত। দেশে বণিক সম্প্রদায়ের অবস্থান ভাল ছিল। সমুদ্র যাত্রার যে সব বর্ণনা কাব্যে দেয়া আছে তা শোনা কাহিনী বলেই মনে হয়। দ্রব্য বিনিময় প্রথা প্রচলিত ছিল। সাধারণত কড়ি দিয়ে কেনাবেচা করা হত।

মঙ্গল কাব্যে যে যুদ্ধ বর্ণনার উল্লেখ আছে তা অনেকটাই কৃত্রিম। যথার্থ বীরত্ব মঙ্গলকাব্যে নেই।

রাজনৈতিক পরিবেশ যে ভয়ানক অরাজকতা সৃষ্টি করেছিল এ ধারণার কোন যুক্তি ও প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে মুসলমান ডিহিদার এবং নবাবরা বিধর্মীদের উপর অত্যাচার করতেন তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বিশেষ করে বিজয় গুপ্তের "মনসামঙ্গল" কাব্যে এবং মুকুন্দরামের "চণ্ডীমঙ্গল" কাব্যে অত্যাচারের কিছু আভাস পাওয়া যায়। কবি কঙ্কণ মুকুন্দরাম কালকেতুর নগর পত্তনের যে বর্ণনা দিয়েছেন সেখানে বিভিন্ন জাতির জীবনযাত্রার সমন্বয় প্রত্যক্ষ করে একটা নতুন সমাজ গঠনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ঘর গৃহস্থালির কথা, বহুবিবাহ, সতীনের জ্বালা, বশীকরণ ঔষধ প্রভৃতির নিখুঁত বর্ণনা মঙ্গল কাব্যে পাই। তবে অষ্টাদশ শতকে অর্থাৎ ভারতচন্দ্রের সময়ে গ্রাম্য জীবনের সরলতা নাগর বিলাসিতার রুচি দ্বারা অভিভূত হয়েছে দেখা যায়। অন্যান্য মঙ্গল কাব্যের তুলনায় ভারতচন্দ্রের কাব্য তাই অনেক অভিজাত। এতদসত্ত্বেও বাঙালি জাতির অন্তরের সাধারণ আর্তিই ভারতচন্দ্রের কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।"[৫৮] অর্থাৎ মোটা ভাত মোটা কাপড় প্রাপ্তিই ছিল সাধারণ অনভিজাত সমাজে আরাধ্য।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জি

১। মুহম্মদ আব্দুল হাই ও আনোয়ার পাশা, চর্যাগীতিকা (সম্পাদনা), ঢাকা–১৩৮৭, পদসংখ্যা–১০, পৃষ্ঠা-৮৫।

২। পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা–৩৩, পৃষ্ঠা-১৪২।

৩। ড. অরবিন্দু পোদ্দার, মানব ধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, শ্রী শান্তিময় প্রিন্টার্স কর্ণার প্রাঃ লিঃ, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৮১, পৃষ্ঠা–২১।

৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২১।

৫। মুহম্মদ আব্দুল হাই ও আনোয়ার পাশা, চর্যাগীতিকা (সম্পাদনা), ঢাকা–১৩৮৭, পদসংখ্যা–৩, পৃষ্ঠা-৬৭।

৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৫৩।

৭। পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা–১৯, পৃষ্ঠা-১১২।

৮। পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা–৪৭, পৃষ্ঠা-১৭৫-১৭৬।

৯। শ্রীভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (১ম পর্যায়), দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা–২৭৭।

১০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২৭৭।

১১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২৮৯।

১২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২৯৫।

১৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২৯৫।

১৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২৯৫।

১৫। ডক্টর মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া, শ্রীরায় বিনোদ : কবি ও কাব্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯১, পৃষ্ঠা-১৮৩।

১৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১৮৫।

১৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১৮৫।

১৮। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১৮৬।

১৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১৮৭।

২০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১৯০-৯১।

২১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১৯৩।

২২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১৯৩।

২৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১৯৩।

২৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১৯৪।

২৫। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২০০-২০১।

২৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২০১।

২৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২২৫।

২৮। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২২৫।

২৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২২৭-২২৮।

Dhaka University Institutional Repository

৩০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২২৮।

৩১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২২৮।

৩২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২২৯।

৩৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২২৯।

৩৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২২৯।

৩৫। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২২৯।

৩৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২২৯।

৩৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২৩০।

৩৮। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২৩০-৩১।

৩৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২৩১।

৪০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২৩১।

৪১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২৩১।

৪২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২৩২।

৪৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২৩২।

৪৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২৩২।

৪৫। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২৩৪।

৪৬। ড. অরবিন্দু পোদ্দার, মানব ধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, শ্রী শান্তিময় প্রিন্টার্স কর্ণার প্রাঃ লিঃ, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৮১, পৃষ্ঠা–৮৫।

৪৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৮৫।

৪৮। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৮৬।

৪৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৮৬।

৫০। ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জী এন্ড কোঃ প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা-৭০০৭৩, (সপ্তম সংস্করণ) ১৯৮৯, পৃষ্ঠা–৫২৭।

৫১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৫১৫।

৫২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৫১৫।

৫৩। ড. অরবিন্দু পোদ্দার, মানব ধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, শ্রী শান্তিময় প্রিন্টার্স কর্ণার প্রাঃ লিঃ, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৮১, পৃষ্ঠা–৯০।

৫৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৯১।

৫৫। শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা, আদিঃ মধ্যযুগঃ আধুনিক, কলিকাতা, ১৯৫৯ (১ম প্রকাশ), পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৯৬৩, পৃষ্ঠা–৪৪।

৫৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৪৫।

৫৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৪৫।

৫৮। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

পূর্ববর্তী কাব্যের সমসাময়িক বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানমূলক কাব্য (লায়লী-মজনু, ইউসুফ-জোলেখা ও সতীময়না লোরচন্দ্রাণী কাব্যের সমাজ ও সংস্কৃতি)

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যাকাশে বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে মুসলিম কবি সাহিত্যিক রচিত বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান মূলক কাব্যকাহিনী। তাঁদের স্বীয় প্রতিভা এবং রচনাশৈলীর উৎকর্ষতায় কাব্যগুলি জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছে বেশ। কাব্যগুলোতে বাস্তব জীবনের অনেক তত্ত্ব এবং তথ্য অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে কবিরা আলোকপাত করেছেন। এ সকল প্রণয়গাথায় মনোবৈচিত্র্য ও সমাজ বাস্তবতার লক্ষণ প্রকাশিত হয়েছে। এ সময়ের প্রধান কাব্যগুলো হচ্ছে– দৌলত উজীর বাহরাম খানের *লায়লী-মজনু*, শাহ মুহাম্মদ সগীরের ইউসুফ *জোলেখা* এবং আলাওলের *সতীময়না লোরচন্দ্রাণী* সমাজ ও সংস্কৃতি বর্ণনার সুবিধার্থে এসব কাব্যের কাহিনী সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা প্রয়োজন। *লায়লী মজনু*, *ইউসুফ জোলেখা* এবং *সতীময়না লোরচন্দ্রাণী* রোমান্স রস মিশ্রিত প্রেমমূলক আখ্যান কাব্য। *লায়লী মজনু* সম্পূর্ণ বিরহমূলক প্রণয় গাথা এবং অপর দুটি কাব্য ট্র্যাজিক কিন্তু পরিণতিতে মিলন দেখানো হয়েছে।

আরব অধিপতি আমীরের একমাত্র পুত্র কয়েস এবং মালিক নন্দিনী লায়লীর আধ্যাত্মিক প্রেম কাহিনীই *লায়লী মজনু* কাব্যের পটভূমি। দু'জনেই প্রায় সমবয়সী এবং একই বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে।

লায়লী শুধু সুন্দরী নয়, বিদ্যাধরীও। প্রথম দিনের সাক্ষাতেই উভয়ে প্রেমবানে বিদ্ধ হলো।

কএস লায়লী মেল শুভ দরশন ভেল
দোহানের জন্মিল পিরীত।।[১]

পাঠশালার পাঠ ভুলে তাঁরা প্রেমের পাঠ চর্চা করে। পাঠশালায় যাত্রাকালে নিভৃতে তাঁরা মিলিত হয়ে প্রাণের গোপন কথা ব্যক্ত করে—

তোহ্মার কমল মুখ দেখিয়া অনুপ।
আকুল হইল মোর নয়ান মধুপ।।

Dhaka University Institutional Repository

তুক্ষি বিনে অকারণ জীবন যৌবন।
তুক্ষি বিনে অকারণ এ তিন ভুবন।।[২]

তারপর দুজনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো–

যাবৎ জীবন প্রেম না করিব ভঙ্গ।
প্রেমের অনলে তনু করিমু পতঙ্গ।।[৩]

তাঁদের প্রেমের কাহিনী গোপন রইল না। লায়লীর মা বিষয়টি জানতে পেরে লায়লীকে পাঠশালায় যাওয়া বন্ধ করে দিলেন।

শুরু হলো লায়লী মজনুর বিরহ জীবন যাত্রা। লায়লীর অসম্মতি থাকা সত্ত্বেও লায়লীর পিতা ইয়েমেনের শাহাজাদা ইবন সালামের সাথে লায়লীর বিবাহ দেন। কিন্তু লায়লী দোচারিনী হতে পারেনি তাই বাসর রাতেই লায়লী তাঁর স্বামীকে পদাঘাত করে ভর্ৎসনা করেছে।

এদিকে মজনুর পাগলামি বেড়ে যায়। সে বনবাসী হয়। বনের শ্বাপদ সংকুল তাঁর নিত্য সহচর। মজনু ভাবে ভাবিত লায়লী তিলে তিলে নিজেকে নিঃশেষ করে ফেলে। মজনু লায়লীর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে কবরে আছড়ে বিলাপ করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত মজনুর নিঃসাড় নিস্তেজ দেহ কবরেই বিলীন হলো। লায়লীর কবরের পাশে তাকে সমাহিত করা হলো।

শাহ মুহম্মদ সগীর রচিত *ইউসুফ জোলেখা* কাব্যটি সম্ভবত মুসলিম কবি রচিত বাংলা সাহিত্যের প্রথম রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান মূলক কাহিনী কাব্য।

পশ্চিম দেশে তৈমুস নামে এক প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। বহু দান ধ্যান করার পর এক কন্যা সন্তান লাভ করেন। রাজা খুশী হয়ে কন্যার নাম রাখেন জোলেখা। জোলেখা বয়ঃপ্রাপ্তা হলেন।

Dhaka University Institutional Repository

যৌবনপ্রাপ্তা জোলেখা তিন বছরে পর পর তিনবার একই পুরুষকে স্বপ্নে দেখেন এবং তার প্রতি প্রেমাসক্তা হন। এই পুরুষ হলেন মিশর অধিপতি আজিজ মিসির। জোলেখার পিতা আজিজ মিসিরের নিকট জোলেখার বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে এক দূত পাঠালেন। দূত সুখবর নিয়ে ফিরে এল। যথাসময়ে জোলেখাকে মিশরে পাঠানো হলো। আজিজ মিসিরের সাথে জোলেখার সাক্ষাৎ হলো। জোলেখা মর্মাহত হলেন কারণ তাঁর স্বপ্নের পুরুষ এবং আজিজ মিসির এক ব্যক্তি নন।

আজিজ মিসিরের সাথে জোলেখা পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন কিন্তু দাম্পত্য জীবনে অসমর্থ হন। জোলেখার ধ্যান, জ্ঞান সবই স্বপ্নের পুরুষকে নিয়ে। বিরহ যন্ত্রণায় তাঁর সময় কাটতে লাগল। জোলেখার যন্ত্রণাক্লিষ্ট হৃদয়ের আর্তি বারমাসীতে বর্ণিত আছে।

কেনান দেশে ইয়াকুব নামে এক নবী ছিলেন। তাঁর দুই স্ত্রীর গর্ভে বার জন পুত্র একজন কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করে এদের মধ্যে রূপে, গুণে, জ্ঞানে, আদর্শে ইউসুফ অতুলনীয়। ঈর্ষা পরবশত ইউসুফের বৈমাত্রেয় ভ্রাতারা ইউসুফকে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়। পিতার অনুমতি নিয়ে ইউসুফের বৈমাত্রেয় ভ্রাতারা তাকে নিয়ে যান মৃগয়ায়। বনের মধ্যে একটি কূপে ইউসুফকে ফেলে তাঁর রক্তমাখা শার্ট নিয়ে পিতাকে দেখিয়ে বললেন ইউসুফকে বাঘে হত্যা করেছে। ইয়াকুব নবী তাঁর পুত্রদের দুরভিসন্ধি বুঝতে পারেন কিন্তু কিছু না বলে শুধুই বিলাপ করতে থাকেন।

ঘটনাক্রমে মণিরু নামক মিশরের এক মহাবণিকের অনুচর কর্তৃক ইউসুফ উদ্ধৃত হয়।

ইউসুফের ভ্রাতারা স্বল্প মূল্যে ইউসুফকে বণিকের কাছে বিক্রয় করেন।

মণিরু বণিক দেশে প্রত্যাবর্তনের আগেই রটে গেছে যে, অনিন্দ্য সুন্দর এক দাস দেশে আসছে। একথা আজিজ মিসিরের কর্ণগোচর হলো। তিনি এক সভার আয়োজন করলেন।

Dhaka University Institutional Repository

ঐ সভায় রাজ্যের যত সুন্দর নারী পুরুষ সবাই উপস্থিত হলেন। বণিক কর্তৃক ইউসুফকে হাজির করা হলো। ইউসুফের রূপে সবাই অভিভূত।

জোলেখা তাঁর পিতৃদত্ত মণি-মাণিক্য দিয়ে ইউসুফকে ক্রয় করলেন।

উল্লেখ্য এই ইউসুফই হচ্ছেন জোলেখার স্বপ্নের পুরুষ। তাই তাকে পাবার জন্য জোলেখা নানা ছল চাতুরীর আশ্রয় নেন। ইউসুফের কাছে তিনি সরাসরি প্রেম নিবেদন করেন। ইউসুফ এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। জোলেখা ধাত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী 'সপ্তখণ্ড টঙ্গী' নির্মাণ করে অপুর্ব সাজে সজ্জিত হয়ে ইউসুফকে ঐ টঙ্গীতে সুকৌশলে এনে প্রেম নিবেদন করেন। জোলেখার চেষ্টা ব্যর্থ হলো এবং ইউসুফ পালিয়ে জোলেখার কাম আক্রোশ থেকে রক্ষা পেলেন বটে কিন্তু ইউসুফের শার্টের কিছু অংশ (পিছন দিক থেকে) জোলেখার হাতে রয়ে গেল। ইত্যবসরে আজিজ মিসির টঙ্গীতে প্রবেশ করেন এবং ইউসুফের বিরুদ্ধে জোলেখা মিথ্যা অভিযোগ আনেন। শাস্তি স্বরূপ ইউসুফকে কারা বরণ করতে হলো।

জোলেখার কলঙ্ক সারা দেশে বায়ুবেগে ছড়িয়ে পড়ল। মুক্তির জন্য তিনি এক ভোজসভার আয়োজন করেন। সেখানে নগরের সুন্দরী রাণীদের আমন্ত্রণ জানানো হলো। ভোজ শেষে আমন্ত্রিতদের ফলাহার স্বরূপ সকলের হাতে একটি করে "তরঞ্জা" এবং কাটবার জন্য একখানা করে "খরশান কাতি" দেয়া হলো। ইউসুফকে ঐ সভায় আনীত হলো, ইউসুফকে দেখে সবাই দিশেহারা হয়ে—

কেহো ফল কাটিতে অঙ্গুলি কাটি নিল।
কিবা কর কিবা ফল এক ন জানিল।।[৪]

ইউসুফকে আবার কারাগারে বন্দী করা হলো কারণ ইউসুপ জোলেখার বশ্যতা স্বীকার করতে রাজী নন। জোলেখার মনে শান্তি নেই। তিনি উন্মাদ অস্থির। একদিন আজিজ মিসিরের অনুমতি নিয়ে কারাগারে সাক্ষাৎ করে ইউসুফকে তিনি পুনরায় প্রেম নিবেদন করেন। এবারও তিনি প্রত্যাখ্যাত হন।

Dhaka University Institutional Repository

জোলেখার হৃদয়ের বিরহ বেদনা উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল। এমনি মুহূর্তে আজিজ মিসিরের মৃত্যু হলো। জোলেখার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল—

দুক্ষের উপরে দুক্ষ দিল বিধি তাঁর।
হস্ত হোন্তে দূর গেল রাজ্য অধিকার।।[৫]

আজিজ মিসিরের পূর্ব নরপতি মিশরের রাজা হলেন। তিনি প্রতাপের সাথে রাজ্য শাসন করতে থাকেন। এরই মধ্যে মিশর রাজ এক অপূর্ব স্বপ্ন দেখেন এবং সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা ইউসুফ দিতে পারলেন বিধায় তিনি কারামুক্ত হলেন। ইত্যবসরে বৃদ্ধ রাজা মৃত্যু বরণ করেন এবং ইউসুফ সহজেই রাজপদ অলঙকৃত করেন। প্রজাদের কোন অভিযোগ ছিল না। কিন্তু জোলেখার অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি পাগলিনীর মত বিলাপ করতে থাকেন। অর্থাভাব, অন্নাভাব তাঁর নিত্য সঙ্গী। তাঁর মাতৃতুল্য ধাত্রী তাঁকে ছেড়ে পরপারের ডাকে চলে গেছে।

জোলেখা যার ধ্যানে মগ্ন থাকতেন তার মূর্তি তার কাছেই থাকত। হঠাৎ জোলেখা পূজার বেদি থেকে দেবীকে নামিয়ে এনে বললেন—

পাষাণ ভাঙ্গিয়া আজি করিমু চৌখণ্ড।
ব্যর্থে সেবা কৈলুঁ তোক জানিলুঁ তু ভণ্ড।।[৬]

তিনি প্রতিমা পূজায় বিশ্বাস হারালেন এবং অদৃশ্য পরমেশ্বরকে পূজা করতে লাগলেন।

দৈব পরিক্রমায় ইউসুফের সাথে জোলেখার সাক্ষাৎ হলো। অতীতের সকল স্মৃতি ইউসুফের মনে পড়ল। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন জোলেখাকে বিবাহ করবেন। ইহাই আল্লাহ্তালার হুকুম। *অন্তরীক্ষ বাণী* লাভ করে ইউসুফ পাত্র মিত্রকে ডেকে এ সংবাদ জানালেন। সবাই উল্লসিত হয়ে শুভ পরিণয়ের ব্যবস্থা করলেন—

শুভক্ষণে চন্দ্রাতপ তুলিলেক রঙ্গে।
ধর্মরি(?) পতাকা তুলিয়া ধ্বজ সঙ্গে।।

Dhaka University Institutional Repository

জথ বাদ্য ভান্ড আছে সর্ব রাজ্য দেশ।
পঞ্চ শব্দে বাদ্য বাজে পুরিআ বিশেষ।।
ঢকি ঢোল দণ্ডী কাঁসী দুন্দ্রুমি নিশান।
মন্দিরা মাদল ভাল তবল বিষাণ।।
দোসরি মোহরি বাজে মৃদঙ্গ বহুল।
শঙ্খনাদ সিঙ্গা ভেরী বাজএ তমুল।।
জয়তুর শর মণ্ডল যন্ত্রতন্ত্র পুর।
নৃত্যগীতে নৃত্যক নাচএ জেহ্ন শূর।।
ঝনঝনি ঝাঁঝরি ঝুমুরি ঝনাকার।
বাঁশী কাঁশী চৌরাশী বাজন অনিবার।।
সানাই বর্গোল বাজে ভেউর কর্ণাল।
করতাল মন্দিরা বাজএ সুমঙ্গল।।
বিপঞ্চী পিণাক বাজে অতি মৃদুস্বর।
কপিলাস রুদ্র বাজএ নিরন্তর।।
বিদ্যাধরী কুমারী নাচএ নানা ছন্দে।
সুর সিন্ধু শৃঙ্গার মদন রস বন্দে।।
সুরপুরী জিনিআ আজিজপুরী সাজ।
বহুল নৃপতি আসি ভরিল সমাজ।।[৭]

অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ইউসুফ ও জোলেখার বিবাহ সমাপ্ত হলো। নব দম্পতির বসবাসের জন্য অন্তঃপুরে সুরম্য টঙ্গী নির্মাণ করা হলো। এই প্রমোদ টঙ্গীতেই জোলেখা পর পর দুটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন। দেশের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ধাত্রীর উপর সন্তানের লালন পালনের ভার দেয়া হলো। ইউসুফ জোলেখা দম্পতি সুখে জীবন যাপন করতে লাগলেন।

কাহিনী এরপরও অগ্রসর হয়েছে। ইউসুফের ভ্রাতৃদের সাথে সাক্ষাৎ। ইউসুফের অনুরোধে পিতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা বনী আমীনের সাথে সাক্ষাৎ।

Dhaka University Institutional Repository

বিধুপ্রভার স্বয়ম্বর সভার আয়োজন, বনী আমীনের গলায় বর মাল্য দান। অতঃপর বনী আমীন বিধুপ্রভার পাণি গ্রহণ এবং গন্ধর্ব রাজ শাহবাল এর মধুপুর রাজ্য লাভ ও সুখে শান্তিতে বসবাস ইউসুফ জোলেখা কাব্যের ঘটনাংশ। অন্যদিকে ইউসুফ পিতা ও বৈমাত্রেয় ভাইসহ রাজ্য পরিচালনা করতে থাকেন।

মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্য চর্চায় মুসলিম কবি সাহিত্যিকরা ছিলেন খ্যাতির শীর্ষে। বিশেষ করে বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানমূলক কাব্য রচনায় তাঁরা শুধু প্রশংসনীয়ই ছিলেন না অন্যতম দিকপাল হিসেবেও ছিলেন পরিচিত। এ সময়ের রোসাঙ্গ নগরীর দু'জন বিখ্যাত কবি হলেন কাজী দৌলত উজীর ও আলাওল, "সতীময়না লোরচন্দ্রাণী" এ দু'জন কবির সম্মিলিত প্রয়াস। কাব্যটি শুরু করেন কবি দৌলত কাজী এবং সমাপ্ত করেন আলাওল।

দৌলত কাজীর *সতীময়না* কাব্যের কাহিনী দুটি অংশে বিভক্ত। প্রথমাংশ লোরচন্দ্রাণী প্রসঙ্গ এবং দ্বিতীয়াংশ ময়নাবতী প্রসঙ্গ।

লোরক রাজার সতী সাধ্বী স্ত্রী ময়নাবতী। রাণীর অকৃত্রিম ভালোবাসাকে উপেক্ষা করে রাজা পারিষদবর্গ সমভিব্যবহারে অরণ্যবিহারে যাত্রা করেন। অরণ্য সভায় জটাধরী ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত এক ব্রাহ্মণ অনন্যা সুন্দরী এক তরুণীর চিত্রপট নিয়ে হাজির হয়। চিত্রপট দর্শনে রাজা মূর্ছা যান। এ তরুণী হচ্ছেন গোহারী নগরের মোহরা রাজার একমাত্র কন্যা চন্দ্রাণী। চন্দ্রাণীর স্বামী এক বামন যিনি ছিলেন নপুংশক।

অরণ্য প্রান্তরে শিকার করে সে সময় কাটাত। চন্দ্রাণীর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রাজা গোহারী দেশে যাত্রা করেন। প্রাসাদ কক্ষ হতে চন্দ্রাণী রাজাকে দেখে মূর্ছা যান। চন্দ্রাণীর ধাইমাতার কূটকৌশলে দর্পণে চন্দ্রাণীর প্রতিবিম্ব দেখে রাজা লোরক জ্ঞান হারান। মন্দিরে রাজা লোরকের সাথে চন্দ্রাণীর চারি চোখের মিলন হয়। চন্দ্রাণীর নিভৃত দুর্গম টঙ্গীতে তারা

Dhaka University Institutional Repository

মিলিত হন। রাজা চন্দ্রাণীকে অপহরণ করেন। শিকার শেষে বামন যখন অবগত হলেন চন্দ্রাণী অপহৃতা তখন তিনি দ্রুতগতিতে রথ চালিয়ে রাজাকে আক্রমণ করেন কিন্তু মল্লযুদ্ধে পরাজিত হন। তরুতলে বিশ্রামরত অবস্থায় চন্দ্রাণীকে সর্পে দংশন করে। মিত্রকণ্ঠ নাম্নী এক যোগী চন্দ্রাণীকে পুনর্জীবন দান করেন। চন্দ্রাণীর পিতা মোহরা রাজন রাজা লোরকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করে রাজ্য অর্পণ করেন। রাজা প্রথমা স্ত্রী ময়নাবতীকে বিস্মৃত হয়ে চন্দ্রাণীকে নিয়ে সুখে জীবনযাপন করতে থাকেন। দৌলত কাজীর রচনার প্রথমাংশ এ পর্যন্ত।

দ্বিতীয়াংশে ময়নাবতীর বিরহ যন্ত্রনার চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। পতি বিরহে তার দিনকাটে। পতির মঙ্গল চিন্তায় সে অহর্নিশি রত। এ সুযোগে ছাতন কুমার মালিনী নামে এক দূতিকে বহু উপহার সামগ্রী ও প্রেমবার্তা দিয়ে ময়নার কাছে প্রেরণ করে। তিলমাত্র বিচলিত না হয়ে ময়না স্বীয় সতীত্বের আদর্শে অটুট থেকে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ময়না ও মালিনী দূতির উক্তি প্রত্যুক্তি কবি বারমাসীতে ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু দুভার্গ্যক্রমে এগার মাসের কাহিনী রচনার পরই কবির মৃত্যু ঘটে বাকী অংশ সমাপ্ত করেন কবি আলাওল।

সতীময়না লোরচন্দ্রাণী কাব্যের অসমাপ্ত অংশ সমাপ্ত করতে গিয়ে আলাওল কোন হিন্দি বা ফারসি পুঁথি অবলম্বন করেন নি এ অংশে কবি পুরোপুরি মৌলিক। এখানে আছে দৌলত কাজীর আরব্ধ ময়নার বারমাসীর অবশিষ্ট জৈষ্ঠ মাসের বর্ণনা। সতীত্বের আদর্শে অবিচল ময়না দূতিকে অপমান ও তিরস্কার করে তাড়িয়ে দেন—

'কুটনীর কেশে ধরি বহুল তাড়িল।

.....

মস্তক মুড়াই মুখে দিল চূণকালি।।'[৮]

আলাওলের কাব্যের পরবর্তী প্রসঙ্গ রতনকলিকা ও আনন্দব্রহ্মা উপাখ্যান। বিরহক্লিষ্টা রাণী ময়নাকে একদিন প্রিয়সখী প্রবোধের বাণী শোনাতে গিয়ে সতীত্ব, সহিষ্ণুতা ও তিতিক্ষার এ উপাখ্যানের অবতারণা করেন। চরম

Dhaka University Institutional Repository

সত্যকথা বলার অপরাধে রাজা উপেন্দ্র কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত মহিষী রতনকলিকার ত্যাগ, তিতিক্ষা, সংযম, ধৈর্য্য ও সাধনার দ্বারা স্বামীকে ফিরে পাবার কাহিনী এ অংশে বর্ণিত হয়েছে। এখানে মদনমঞ্জরী ও আনন্দব্রহ্মা উপাখ্যানের কথাও বর্ণিত হয়েছে। মদনমঞ্জরীও রতনকলিকার আদর্শে আদর্শায়িত। তিনিও সাধনা ও সংযমের পুরস্কারস্বরূপ আনন্দব্রহ্মাকে পতি হিসেবে পেয়েছেন। নানা পরীক্ষা ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে রতনকলিকা, আনন্দব্রহ্মা, মদনমঞ্জরী এবং উপেন্দ্রদেবের মিলন দেখানো হয়েছে। এ অংশে সততার বিজয় এবং অসত্যের পরাজয় দেখানো হয়েছে।

রাণী ময়নামতী প্রিয়সখীর মুখে বিধিলিপির এবং ধৈর্য্য ও সতীত্ব রক্ষার এ কাহিনী শুনে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে অনুরোধ করে তার বিবরহবার্তা রাজা লোরের কাছে পৌঁছে দিতে। রাণীর অনুরোধে ব্রাহ্মণ বিমলা নামে এক বাকপটিয়সী সারি পক্ষীকে গিয়ে লোরের সভায় উপস্থিত হয়। সারি পাখি ও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কাছে রাণী ময়নাবতীর বিরহের কাহিনী শুনে রাজা লোর অনুতপ্ত হলেন এবং চন্দ্রাণীসহ স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নিলেন। রাজা লোর এবং চন্দ্রাণীর ঘরে প্রচন্ডতপন নামে এক পুত্রের জন্ম হয়। রাজা পুত্র প্রচন্ডতপনকে বিয়ে করিয়ে এবং রাজসিংহাসনে বসিয়ে চন্দ্রাণীকে নিয়ে স্বদেশে ফিরে এলেন। রাণী ময়নাবতীর সঙ্গে রাজার পুনর্মিলন হয় এবং দুই স্ত্রীকে নিয়ে রাজা সুখে জীবনযাপন করতে থাকেন। বৃদ্ধ বয়সে রাজা ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে মারা গেলে দুই রাণী রাজা লোরের চিতায় সহমৃতা হলেন। বিষাদের মধ্য দিয়ে কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে।

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যযুগের কাব্য প্রবাহে দৌলত উজীর বাহারাম খান বিরচিত *লায়লী মজনু* কাব্যটি নানা গুণে ভাস্বর। একদিকে প্রেমের একনিষ্ঠতা অন্যদিকে সমাজ সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা কাব্যটিকে পরিপূর্ণতা দান করেছে। দুই অবোধ বালক বালিকার রোমান্টিক প্রেমই কাব্যটির মূল বক্তব্য। সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতির উর্ধ্বে নয়। *লায়লী মজনু* কাব্যের সমাজ ও সংস্কৃতির বিচিত্র ধারা নিম্নরূপ:

আরব অধিপতি আমীরের একমাত্র পুত্র কয়েস। সুতরাং এ পরিবারটি নিঃসন্দেহে সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবার। অন্যদিকে অনিন্দ্য সুন্দরী লায়লীর পিতা মালিক সদাগর। তিনিও অর্থে বিত্তে অতুলনীয়। উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের অন্যান্য প্রতিনিধি হচ্ছেন– ইয়েমেনের অধিপতি ইবন সালাম (লায়লীর বিবাহিত স্বামী) নওফেল রাজ এবং সেলিম নামে জনৈক ধনী ব্যক্তি। এঁরা সবাই সম্ভ্রান্ত মুসলিম শাসক এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি।

আলোচ্য কাব্যে অন্যান্য বৃত্তিজীবীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য– দারোয়ান, মালি, নাপিত, ভিক্ষুক, কুটনী বুড়ি, দেহরক্ষী, পীর দরবেশ। এছাড়াও এ কাব্যে আমরা হিংস্র পশুপাখি যেমন- বাঘ, সিংহ, সাপ, হরিণ প্রভৃতির বর্ণনা পাই যারা পরম মমতা ও যত্নে কয়েসকে আগলে রেখেছিল।

কুটীল প্রকৃতির লোক সব সময় সমাজে কম বেশি প্রত্যক্ষ করা যায়। এ কাব্যে এ প্রকৃতির একজন বুড়ীর পরিচয় পাই যে লায়লীর বিয়ের সংবাদ মজনুর কাছে পৌঁছে দেয়।

ক্ষৌর কর্মে নিয়োজিত নাপিত সবসময়ই সমাজে অতি প্রয়োজনীয় ব্যক্তি হিসেবে সমাদৃত হন। মজনুর পিতা লায়লীর পিতার নিকট বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যাবার পূর্বে মজনুকে নাপিতের কাছে নিয়ে যান ক্ষৌর কর্ম করানোর জন্য—

করপদ নখ তার শিরের কুণ্ডল
খেউর করিয়া অঙ্গ করিলা নির্মল।
খেউর করাই অঙ্গ মর্দন করিলা
স্নান করাই ভাল বস্ত্র পরাইলা।[৯]

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যযুগের সমাজ ব্যবস্থায় পীর দরবেশের প্রতি মানুষের অগাধ বিশ্বাস প্রায় প্রতিটি কাব্যেই পরিলক্ষিত হয়। কয়েসের জন্মের পর দরবেশের উপস্থিতি এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেয়। দরবেশ কয়েসে'র ভাগ্য গণনা করেন–

কিন্তু জন্মিল যখন লাড়কা তোমার
সেই ওক্তে নেক ছিল যোগ ছেতারার।
কিছু নাহি কহা যায় তকদিরের বাতে
নছিবের লেখা যাহা কে পারে চিনিতে।
এই যে ফরজন্দ পয়দা হৈল আপনাকে
আশকে ছাদেক রবে না যাবে ফাছেকে।
হইবে আশক এক রূপসী দেখিয়া।
দেওয়ানা হইবে তার ছুরতে মাতিয়া।[১০]

মজনুর পিতা মজনুকে নিয়ে দরবেশের কাছে যান। দরবেশ মজনুকে নিম্নোক্ত ঔষধ দেন—

লায়লীর হাত হৈতে তাগা বানাইয়া
তাবিজ মজনুর হাতে দিবেক বান্ধিয়া।
আর লায়লী যে মকানে থাকে বরাবর
মাটি থোড়া মাঙ্গাইয়া লিবে সেথাকার।[১১]

মধ্যযুগে কাব্য প্রবাহে বাউল– বৈরাগী বা যোগী সম্প্রদায়ের আধিক্য ছিল। বাউল ছিল সহজ উপমার বিষয়—

(১) আউল করএ কেশ বাউলের বেশ।[১২]
(২) বিকশিত তনু মাতা মুকলিত কেশ
পরিধান পিতাম্বর যোগিনীর বেশ।[১৩]

নর্তকী ও গায়ক সম্প্রদায়ের পরিচয় আলোচ্য কাব্যে প্রত্যক্ষ করি। বাদশা একমাত্র পুত্রের মনোরঞ্জন এবং আনন্দ বিনোদনের জন্য গৃহে নর্তকী, গায়ক ও বাদ্য যন্ত্রাদির সুব্যবস্থা করেন–

Dhaka University Institutional Repository

নৃত্যগীতি নানা রঙ্গ কুতূহল
নৃত্য দেখিবারে দিলা নটক সুন্দর
নৃত্য গীত নটরঙ্গ যন্ত্র যথ ইতি।[১৪]

কর্মফল, অদৃষ্টবাদ, জন্মান্তরবাদ প্রভৃতিতে তৎকালীন সমাজের মানুষের দৃঢ় আস্থা ছিল।

সাধারণত সন্তানের বয়স পাঁচ বছর পূর্ণ হলেই পাঠশালে ভর্তি করার নিয়ম ছিল। কয়েসের বয়স দশ বছর পূর্ণ হলে বাদশা খুব ধুমধাম করে প্রথমে "খাতনা দেলায় তার ছুন্নতের কাম।"[১৫] তারপর পাঠালেন পাঠশালায়। মালিক নন্দিনী লায়লী ঐ একই দিনে পাঠশালায় ভর্তি হয়। ওস্তাদ দু'জনকে খুব যত্ন করে পড়াতেন।

পাঠশালায় ছেলেমেয়েরা 'গুরুর চরণ ভজি, কুতূহলে চিত্ত মজি, শাস্ত্র পাঠ পড়ন্ত সদাএ"।[১৬] গুরু ভক্তি তৎকালীন সমাজে প্রবল ছিল। বিদ্বান পুরুষকে ভাগ্যবান মনে করা হত। সমাজে বিদ্বান পুরুষের খুব কদর ছিল—

ভাগ্যবন্ত পুরুষের বিদ্যা অলঙকার
বিদ্যা যে গলার হার বিদ্যা যে শৃঙ্গার।
পুরুষ সুন্দর অতি রূপে অনুপাম
গুণ না থাকিলে তার রূপে কিবা কাম।
পুরুষ বাখানি যদি হএ গুণধাম।।[১৭]

নারী শিক্ষা তৎকালীন সমাজে প্রায় উপেক্ষিত ছিল। সম্ভ্রান্ত পরিবারে নারী শিক্ষা প্রচলিত ছিল তবে সে শিক্ষা ছিল প্রাথমিক জ্ঞানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহ তেমন ছিল না। পতিব্রতা নারী সমাজে বেশি প্রশংসিত ছিলেন—

"যুবতী রাখানি যদি পতিব্রতা নাম।"[১৮]

Dhaka University Institutional Repository

প্রেম ভালোবাসার মূল্য সে যুগে অনেক ক্ষেত্রেই স্বীকৃত ছিল না। পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া, নিভৃতে দেখা করা সমাজ বিগর্হিত অপরাধ ছিল। লায়লীর মাতা এ অপরাধের ভয়ে মজনুর সাথে লায়লীকে মেলামেশা করতে দেননি। এটা তিনি জঘন্যতম অপরাধ এবং আরব সমাজের কলঙ্ক বলে মনে করেন—

শতেক ভাবক তোর হোক কদাচিত
ভাবিনী হইতে তোর না হএ উচিত।
কুলের নন্দিনী হৈয়া নাহি কুললাজ
কলঙ্ক রাখিলি তুই আরব সমাজ।।[১৯]

নাচগান ও বাজনার প্রচলন মধ্যযুগের প্রায় প্রতিটি কাব্যে প্রত্যক্ষ করি। এগুলো চিত্ত বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে প্রচলিত ছিল। বিশেষ করে বিবাহানুষ্ঠানে নাচ গান ও বাজনার সমারোহ থাকত। উজির হামিদ খানের দান ধ্যানের কথা নর্তক ও গায়েনের মুখেই দেশময় প্রচারিত হয়েছিল—

নটক গাইন গণে সত্য যথ কৃতি ভণে
প্রকাশ হইল সর্বদেশ।।[২০]

লায়লীর বিয়ের সময় বিবিধ প্রকার বাদ্য এবং বাজনের ব্যবস্থা হয়েছিল—

উচ্চ রব দামা সব গর্জিত আকাশ
পঞ্চ শব্দে বাদ্য বাজে শুনিতে উল্লাস।
সানাই বিগুল বাজে ভেউর কনাল
অনেক মধুর বাদ্য বাজাএ বিশাল।[২১]

মেয়েদের মধ্যেও নাচ গানের চর্চা হত। লায়লীর বিয়ের সময় তাঁর সখিদের মধ্যে নাচ গান ও সঙ্গীত চর্চার উল্লেখ আছে—

"কেহ করে নৃত্য, কেহ গাএ গীত, কেহ বসি রঙ্গ চাএ"[২২]

Dhaka University Institutional Repository

মাতাপিতা ও গুরুজনে ভক্তি শ্রদ্ধা সব ধর্মে সব স্তরে স্বীকৃত। *লায়লী মজনু* কাব্যে মাতাপিতার মর্যাদা সম্পর্কে হিন্দু মুসলিম ধারনার সংমিশ্রণ প্রত্যক্ষ করি–

জনক জননী দোঁহা মহিমা সাগর
স্বর্গ হন্তে দুর্লভ ভূমিত গুরুতর।
অতি পূজ্যতম যেন পরমার্থ দেবা
সর্ব কার্য উপাধিক মাতাপিতা সেবা।
তোহ্মা আজ্ঞা লঙ্ঘিলে জন্মএ মহাপাপ
ইহলোকে পরলোকে বিষয় সন্তাপ।
দেববাণী সমান জানিলুঁ তত্ত্বসার।[২৩]

হিন্দু ধর্মে "পিতাস্বর্গ পিতা ধর্ম পিতাহি পরমংতপর" প্রতিধ্বনি দেখি– (মজনু তাঁর পিতাকে উদ্দেশ্য করে)

তুহ্মি সে মোহর গতি মনের আরতি
এহলোকে পরলোকে পরম সারথি।
লোম প্রতি শতমুখ যদি হএ মোর
কহিতে তোহ্মার গুণ নাহি অন্ত ওর।[২৪]

লায়লীর উক্তিতে মাতৃভক্তির পরিচয় নিহিত–

লক্ষ অব্দ যদ্যপি তোহ্মার সেবা করি
তোহ্মাগুণ পরিশোধ করিতে না পারি।[২৫]

মধ্য যুগের সমাজ ব্যবস্থায় পণ প্রথার উল্লেখ অনেক কাব্যে লক্ষ্য করি। বংশ মর্যাদায় যে বংশ কুলশীল তারা পণ গ্রহণ করত। লায়লীর বিয়ের পয়গাম পাঠানোর সময় কয়েসের পিতা লায়লীর পিতাকে কনে পণ সেধেছিলেন। বিত্তবানরা যৌতুক বা পণ হিসেবে জমাজমি, দাসদাসী, ঘোড়া, হাতি, উট, মূল্যবান স্বর্ণালঙ্কার, হীরা মানিক, রতন এমনকি রাজ্য পর্যন্ত দান করার প্রচলন মধ্যযুগে ছিল। বিত্তহীন বা গরীব সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধ্যানুসারে পণ প্রদানের রীতি ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

নগদমুদ্রা, অলঙ্কার ও দ্রব্যাদি নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়কে যৌতুক বা পণ হিসেবে দেয়া হত। এ ধারা আজও যে আমাদের সমাজে প্রচলিত নেই তেমনটি বলা যাবে না তবে ব্যতিক্রম যে, কনে পণ দেয়ার প্রচলন নেই পরিবর্তে বর পক্ষে পণের পরিমান দিন দিন উর্ধ্বগতিতে বাড়ছে। কয়েসের পিতা লায়লীর পিতাকে যে সকল দ্রব্য সেধেছিলেন–

বহু মূল্য ধন দিমু রজত কাঞ্চন।
প্রদীপ সমান দাস রুমী একশত।।
শতেক হাবসী দিমু যেন প্রতিপদ।
দুইশত উট দিমু শতেক তুরঙ্গ।
পঞ্চশত বৃষ দিমু পঞ্চাশ মাতঙ্গ।।[২৬]

শুভ কাজে ও বিয়ের সময় তিথি লগ্ন মানা হত। লায়লীর বিয়েতেও "শুভক্ষণে লগন করিয়া কুতূহলে"[২৭] বিবাহানুষ্ঠানের মঞ্চটি তৈরি করা হত নানা কারু কাজের সমন্বয়ে। সজ্জিত মঞ্চটির নাম ছিল মারোয়া। শুভ দৃষ্টির সময় চার চোখের মিলন হত এ সময় বর ও কনে পক্ষের সখি বন্ধু ও আত্মীয় স্বজনরা নানা রঙ্গ রসের ব্যবস্থা করতেন যার নাম জলুয়া। বিয়ের পর বর কনের মধ্যে পাশা খেলার প্রচলন ছিল এর নাম গেরুয়া খেলা। হিন্দু সমাজে কড়ি খেলার প্রচলন দেখি। বর কনেকে অন্য বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে যে অভ্যর্থনা দেয়া হত তাকে বলা হত গস্ত ফিরানো। মারোয়ার উল্লেখ—

মারোয়া সাজন হৈল বিচিত্র সুঘট
স্থাপিলা রসাল পত্র সুবর্ণের ঘট।[২৮]

জলুয়ার উল্লেখ—

যথ আছে শাস্ত্রেত খুতবা পড়াইল তত
জুলুয়া দিলেন্ত তার শেষে
দেখিয়া মালিকার মুখ আলিমের মনেত সুখ
পুরিলেক মনের বাঞ্ছিত।[২৯]

Dhaka University Institutional Repository

এর সঙ্গে যুক্ত হত মধুর বাদ্য—

অবলা সুন্দরীগণ সুবেশ উত্তম
কৌতুকে করএ নাট অতি মনোরম।[৩০]

অনুষ্ঠানে এসব পর্বের বিচার মজলিসে উপবিষ্ট সমাজপতি বা শাস্ত্রজ্ঞরা অনুষ্ঠান শেষে করতেন–

"বিচার করএ শাস্ত্র পণ্ডিত সকলে"[৩১]

কন্যার বাড়িতে বিয়ের প্রস্তাব চূড়ান্ত করা অথবা বরানুগমনের সময় নানা প্রকার খাবার ও নাস্তা দেয়ার প্রচলন সর্বসময়ে সর্ব সমাজে স্বীকৃত। মিষ্টি ও পান সুপারি দেয়ার প্রচলন ছিল। মজনুর পিতা পয়গাম নিয়ে গিয়ে ছিলেন– ইষ্ট মিষ্টগণ সঙ্গে– ইবন সালাম ও বিয়ের সময়:

"ষোল রস সঙ্গে করি রঙ্গ কুতূহলে।"[৩২]

বিয়ের সময় কন্যাকে সুসাজে সজ্জিত করা হত। যদিও আধুনিক কালের মত সাজের উপকরণ এতটা ছিল না তবুও লায়লীর সখিরা মিলে নানা রঙ্গরসের মধ্য দিয়ে লায়লীকে সজ্জিত করে। কনে সাজের সময় সখিরা নানা মেয়েলী গান গেয়ে উৎসবটিকে আরও আনন্দ মুখর করে তোলে—

কুমারীক চারিদিকে করিলা মাতলি
কেহ কেহ সহে'লা গায়ন্ত মনোরঙ্গে
উপটন দিয়া কেহ কুমারীর সঙ্গে
কেহ কেহ দুষ্টরঙ্গে দিলেক ভুলাই
কেহ কেহ বলে ছলে দেয়ন্ত গোছল।
যতনে পৈরাএ কেহ সুরঙ্গ অম্বর।
রত্ন আভরণ কেহ কন্যাকে পৈরাএ।[৩৩]

সখিরা কনেকে বাসর ঘরে দেয়ার সময় ও রঙ্গরস করত–

রচিত কুসুম শয্যা দেখিতে আনন্দ
সখীগণে তথা নিয়া কন্যাক রাখিলা।[৩৪]

Dhaka University Institutional Repository

নারীদের প্রিয় জিনিসের মধ্যে অলঙ্কার ও প্রসাধনী উল্লেখযোগ্য ছিল। বিভিন্ন প্রকার অলঙ্কার ও প্রসাধনীর বর্ণনা মধ্যযুগের সাহিত্যে প্রত্যক্ষ করি। লায়লী মজনু কাব্যেও ব্যতিক্রম ঘটেনি। রমণীরা শীর্ষে সিন্দূর ও কপালে চন্দন তিলক পরত। নখে মেহেদী রঙ দিত। মণি খচিত বেশর: মুক্তা মাণিক্য খচিত সপ্ত ছড়ি হার, কণক কিঙ্কিণী : রত্নখচিত বাজুবন্দ, কঙ্কণ, রত্ন অঙ্গুরী, চরণে নূপুর। এছাড়াও বিবিধ ধাতব ও রত্নের আভরণ থাকত। বিচিত্র অম্বর দিয়ে মোহন দোলরী সাজ করতে পছন্দ করত। চুলের বেণীতেও রত্নখচিত বা পুষ্প মণ্ডিত থাকত। প্রসাধনী দ্রব্যের মধ্যে প্রধান ছিল অঞ্জন, সুর্মা, তাম্বুল রাগ সিন্দূর, চন্দন, মেহেদী, কুমকুম, কস্তুরী প্রভৃতি।

পুরুষদের পোশাকের বর্ণনা তেমন পাওয়া যায় না তবে প্রসঙ্গত উল্লেখ আছে—

অঙ্গেত বসন নাহি শিরে নাহি পাগ
পদ হস্তে পাদুকা করিলা পরিত্যাগ।[৩৫]

মেলা, মজলিস, উৎসব, পার্বণ, হাট বাজার, অফিস আদালত এমনকি আত্মীয় স্বজনদের বাড়িতে বেড়াতে গেলে সেকালে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরাও ছাতা ব্যবহার করত। পাদুকার প্রচলন খুব বেশী ছিল না। তবে সম্ভ্রান্ত লোকেরা জরির কাজ করা আলখাল্লা ও জুতা পরিধান করত।

পিতৃপ্রধান সমাজ হিসেবে পরিবারে পুত্র সন্তানের আদর যত্ন বেশি হত। পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সবাই খুশী হত। একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসেও সমাজে এ মানসিকতার পরিবর্তন হয়নি। মুখাগ্নি, শ্রাদ্ধ, পিণ্ডদান পুত্র দ্বারা সম্পাদিত হয়। হিন্দু সমাজের এ ধারণা মুসলিম সমাজেও প্রচলিত ছিল। পুত্র সন্তান দিয়ে সংসারে সুখ ও পরলোকে কর্ম—এ ধারণা সমাজে বদ্ধ মূল ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

(১) রেণু এক পুত্র অঙ্গে যদি সে লাগএ
গিরি ভাঙ্গি পড়ে যেন জনক মাথাএ ।
তনয় চরণে যদি কন্টক পশিল ।
জননী মরমে যেন শেল প্রবেশিল
চন্দ্র বিনে গগন, প্রদীপ বিনে ঘর ।
পুত্র বিনে জগৎ লাগএ ঘোরতর ।।[৩৬]

(২) কুলের নন্দন হৈলে গুণের আগল ।
পদ্মবনে বিকশিল যে হেন কমল ।
শরীরে অঞ্জনী যেন পুত্র সুপণ্ডিত ।
তেজিতে লাগএ দুঃখ রাখিতে কুৎসিত ।[৩৭]

স্থান, কাল, পাত্র ও সময় ভেদে সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তন হয় ফলে সমাজ ও সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দেয়া দুঃসাধ্য। মানুষের আত্মপ্রকাশের ধারা বিচিত্র। দেশ, কাল, সময়, বিশ্বাস, সংস্কার আচার আচরণ দ্বারা সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রিত হয়। সমকালের সব ঘটনায় মানুষের মনে ছায়াপাত করে না। জীবনের সর্বোতমুখী চেতনা কোন এক মানুষের চিন্তা চেতনায়, কর্মে ও আচরণে ধরা দেয় না। শাহ মুহম্মদ সগীর *ইউসুফ জোলেখা* কাব্য গ্রন্থের রচয়িতা। আজ অবধি প্রাপ্ত তথ্যের বিচারে শাহ মুহম্মদ সগীরকেই আমরা প্রাচীনতম কবি বলে মনে করি।

ইউসুফ জোলেখা কাব্যে সমাজের যে পরিচয় বিধৃত সেখানে সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের কাহিনীই বর্ণিত আছে। তাঁদের জীবন যাত্রার ধারা ছিল অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ এবং বিলাস বহুল। রাজা বাদশার জীবন চিত্র এই কাব্যে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিহিত। তৈমুস রাজ (জোলেখার পিতা) একজন প্রতাপশালী রাজা তাঁর একমাত্র কন্যা জোলেখা। মিশরের রাজা আজিজ মিসির, কেনান রাজ্যের এয়াকুব নবী, গর্দ্ধবরাজ শাহবাল তাঁর একমাত্র কন্যা বিধুপ্রভা, এয়াকুব নবীর বার পুত্র। তার মধ্যে ইউসুফ রূপে

Dhaka University Institutional Repository

গুণে অনন্য। এঁরা সবাই বিত্তশালী পরিবারের সদস্য। অন্যদিকে রাজকর্মচারী, উজির ও রাজ অণুচর বৃন্দের পরিচয় এ কাব্যে উল্লেখ আছে।

নিম্ন বিত্তজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে ধাত্রী, চাকর-চাকরাণী এবং বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে মণিরু বণিকের উল্লেখ পাই।

ইউসুফ জোলেখা আখ্যান ভাগটি পবিত্র কোরআন এ 'সূরা ইউসুফ' অধ্যায়ের অন্তর্গত। কোরআনে ১২ রুকুর ১১১টি আয়াতে কাহিনীটি বিধৃত। কাব্যটির মূল লক্ষ্য ধর্মোপদেশ —

কহিমু কিতাব চাহি সুধারস পুরি।
শুনহ ভকত জন শ্রুতি-ঘট-ভরি
দোষ খেম গুণ ধর রসিক সুজন।
মোহাম্মদ ছগির ভনে প্রেমক বচন।।[৩৮]

মাতাপিতা এবং গুরুজনের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধার কথা আলোচ্য কাব্যের প্রথমে প্রত্যক্ষ করি। কবি প্রথমে মহান সৃষ্টিকর্তা, তারপর মাতাপিতা ও গুরুজনদের প্রণাম ও ভক্তি শ্রদ্ধা করতে আদেশ দিয়েছেন—

(১) প্রথম প্রণাম করোঁ পরবর্দিগার।
যে আল্লা বকশিন্দা খোদা করিম ছত্তার।।[৩৯]

(২) দ্বিতীয়ে প্রণাম করোঁ মাও বাপ পাএ।
যা'ন দয়া হন্তে জন্ম হৈল বসুধায়।।[৪০]

(৩) ওস্তাদে প্রণাম করোঁ পিতা হোন্তে বাড়
দোসর জনম দিলা তিহঁ সে আক্ষার।।[৪১]

সুফীতত্ত্বের উল্লেখ আছে নিম্নোক্ত ছত্রে—

"নিরঞ্জন মকারেত প্রেমে সে মজিলা
এহি লক্ষ্যে যথ জীব সৃজন করিলা"।[৪২]

Dhaka University Institutional Repository

জন্মান্তরবাদ, অদৃষ্টবাদ এবং নিয়তিতে বিশ্বাস মধ্যযুগের প্রায় প্রতিটি কাব্যেই পরিলক্ষিত হয়। কর্মের লিখন না যায় খণ্ডন– এ চরম সত্যকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না–

(১) তোর কর্মে লেখা আছে এ থেকে নিবন্ধ।[৪৩]

(২) কর্মফল লিখিত তোহ্মার হেন জান।[৪৪]

(৩) দৈব্যের নিবন্ধ আছে কর্মের লিখিত।[৪৫]

(৪) মোর শুভ দশা আছে কর্মের লিখন।[৪৬]

আমন্ত্রিত অথবা রাজকার্যে আগত অভ্যাগতকে সাদরে অভ্যর্থনা জানানোর উল্লেখ আছে। মিশরে জোলেখাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানানো হয়—

আজিজের অন্তঃপুরে যথ নারীগণ
বাড়িয়া নিবারে আইল হরষিত মন।
ঘট-দীপ লৈয়া লোক হৈলা আগুয়ান
যুবক-যুবতী সবে ধরিল যোগান।
দোহান উপরে কৈলা পুষ্প বরিষণ
গুলাল চামেলী চম্পা সুবর্ণ গঠন।
রতন মণ্ডিত মালা কুসুম নির্মাণ
আজিজ জলিখা গলে করিল সন্ধান।[৪৭]

তৎকালীন সমাজে বিয়ের আগে কন্যা তাঁর হবু পতির সাথে সাক্ষাৎ করবে এটা ছিল অকল্পনীয়। যদি কোন কন্যা এমনটি করে তাহলে তাকে দুশ্চিরিত্রা বলা হত। জোলেখার আবেদনে ধাত্রীর প্রত্যুত্তর—

ন জানোঁ কি আছে মোর কর্মেত নিশ্চয়
করহ উপাই ধাত্রি দেখোঁ পরতেখ।
স্বপ্নেত দেখিলুঁ মুত্রি জেন রূপ রেখ।।
কন্যার বচন শুনি ধাত্রি বোলে পুনি।
হেন অসম্ভব বাক্য কভো নহি শুনি।।
তুহ্মি অকুমারী বালা জগত বিদিত।
বিবাহ সম্বন্ধ আগে দেখা অনুচিত।।[৪৮]

Dhaka University Institutional Repository

বিবাহানুষ্ঠানে তিথি লগ্ন মানা হত। শুভলগ্ন দেখে বিবাহের দিন ধার্য করা হত। বিত্তশালী বা রাজা বাদশাহর বিবাহ অনুষ্ঠান অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে সম্পন্ন হত। বিভিন্ন প্রকার আতস বাজি, বন্দুক, পটকা ফুটিয়ে বিবাহের সংবাদ চারিদিকে জানিয়ে দেয়া হত। উৎসবে সাধারণত দোতারা, সারঙ্গী, ঢোলক, দণ্ডি, কাঁসি প্রভৃতি বাদ্য বাজানোর প্রচলন ছিল। বিবাহানুষ্ঠানে বাদ্য বাজানোতে কোন প্রতিবন্ধকতা ছিল না। স্বয়ং আজিজ মিসির তাঁর বিবাহ উপলক্ষে বাদ্য বাজানোর আদেশ দেন —

নৃপতি আদেশ কৈল বাজিতে বাজন।
সৈন্য সেনাপতি মোর করউ সাজন।।
দুন্দুভির শব্দে পূরিল দিগান্তর।
ঢাক ঢোল দন্ডি কাঁসি বাএ সুস্বর।।[৪৯]

বরের বাহন : বরের সাজে সজ্জিত হয়ে আজিজ মিসির চারিজনে বাহিত চর্তুদোলে করে বিবাহে যাত্রা করেন। চারিপাশে অতিথিগণ ছাতা ও পতাকা ধরে হাটতে থাকে–

চলিলেন আজিজ চৌদোলে আরোহণ।
ধ্বজ ছত্র পতাকা চলিল সারি সারি।।[৫০]

বিবাহানুষ্ঠানে কিছু নিয়ম কানুন ও আচার পার্বণ পালন করার রীতি উক্ত কাব্যে লক্ষ্য করা যায়–

ব্রাহ্মণে পঢ়এ বেদ মন্ত্র উপচারি
কবিত্ব পঢ়এ ভাট পিঙ্গল বিচারি।।
বহু গুণীগুণ সঙ্গে রঙ্গ অভিলাষ।
বিবাহ আনন্দ রঙ্গ মনেত উল্লাস।।[৫১]

সুখের কাহিনী রচনাতেই যে কবি পারদর্শী ছিলেন তা নয়। ইউসুফ *জোলেখা* কাব্যে করুণ রসের চিত্রও প্রত্যক্ষ করি জোলেখার বিলাপের মধ্য দিয়ে—

Dhaka University Institutional Repository

গগনে তারক দেখি চাহে একমন।
তার সঙ্গে কাহিনী কহয় সর্বক্ষণ।।
তুমি সব ভ্রমিতে আছহ রাত্র দিন।
তোমা অবিদিত নাহি ভুবন এ তিন।।
দুস্কের কাহিনী কহি গোঞায় রজনী
বিশেষ তাপিত মন বিরহ আগুনি।।
চান্দ ভেল মলিন বিরল তারাগণ।
অরুণ উদয় হৈলে হয় আনমন।।
প্রভাতে পাখালে মুখ নয়নের জলে।
রুদিত বদন তান প্রতি উষাকালে।।[৫২]

কবি জোলেখার বারমাসী বর্ণনার মধ্য দিয়ে বাঙালি গৃহ বধূর বিরহ বেদনাকেই মূর্ত করে তুলেছেন। মাঘ মাস থেকে শুরু করে কবি পুরো বছরের ঘটনা পর্যায়ক্রমে জোলেখার অন্তর্বেদনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন–

মাঘ হৈল পরকাশ কানন কুসুম হাস
শুভ ছিরি পঞ্চমী প্রকাশ।
.....
মলয়া সমীর ধীর হৃদয় অন্তরে পীড়
বিরহিণীজন অহর্নিশ।।
.....
আষাঢ় আইল ঘন সখন তিমির বন
নিশি দিশি নাহিক প্রকাশ।
.....
মুঞি বড় হতভাগী অহনিশি রহোঁ জাগি
প্রভু মোর নিদয়া হৃদয়।
মোহাম্মদে কহে দুখী অবশ্য হইবা সুখী
নিশি শেষে রবির উদয়।।[৫৩]

Dhaka University Institutional Repository

কবি মিশর দেশের কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে বাংলাদেশের ঋতু বৈচিত্র্য বর্ণনা করেছেন। রাজ্ঞী জোলেখা এবং মিশর দেশের পটভূমি কবির চোখে বাংলার বিরহিনী বধূ এবং বাংলাদেশের রূপ বৈচিত্র্যই ফুটে উঠেছে। তিনি জোলেখার বিরহবোধকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অনুভব করেছেন।

শাহ মুহম্মদ সগীরের ইউসুফ জোলেখা কাব্যে বিভিন্ন প্রকার অলঙ্কারের বিবরণ পাই। সে সময়ে মুসলিম মেয়েরা যে সমস্ত অলঙ্কার পরিধান করত তা আজও আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে আমাদের সমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে কিন্তু মেয়েরা পুরুষের চেয়ে বেশি রক্ষণশীল বিধায় মেয়েদের পরিবর্তন খুব বেশি প্রত্যক্ষ করা যায় না। মেয়েরা সাধারণত হীরার হার, মাথা ঝাঁপটা বা সিঁথে পার্টি, গজমতি হার, অঙ্গুরী, চিত্রিত বসন, জরোয়া নথ, তাড়, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী, নেউর, বাজুতে বাজু বন্দ প্রভৃতি পরিধান করত—

গীতগত হীরা হার রচিত সুবর্ণ সার
গজমোতি বিরাজিত পাঁতি।
তাহাত কুসুম মালা বিশেষ শোভিত ভালা
বিনা সূতে গাথে কত ভাতি।।
কাঞ্চুলী মণ্ডিত হার সুরচিত পয়োভার
বসন ভূষণ আভরণ।
সুলক্ষ্য লাবণ্য বেশ মোহিত সকল দেশ
উনমত্ত নবীন জৌবন।।
করেত কঙ্কণ বর জেহ্ন চন্দ্র দিবাকর
কনক মাণিক্য জুতি সার।
নানা অলঙকার রঙ্গ সুবর্ণ রতন সঙ্গ
রূপে শচী জেহ্ন অবতার।।
বাহুদণ্ডে তাড় তারি সুবর্ণ উঝল ধারী
চুনি মণি বিচিত্র নির্মাণ।
অঙ্গুরি মাণিক্য জুড়ি দশাঙ্গুলে ভরিপুরি

Dhaka University Institutional Repository

বহুমূল্য ভূষণ বিধান।।

কটিত কিঙ্কিণী বাজে জেহ্ন চন্দ্র সূর সাজে

কি কহিমু তাহার বাখান।

চরণে নূপুর বাজে কনক রতন সাজে

তাত জুতি চমকে চরণ।।[৫৪]

মেয়েদের ব্যবহার উপযোগী প্রসাধন দ্রব্যের একটি তালিকা পাই *টঙ্গীতে ইউসুফ জোলেখা* অংশে–

জলিখা করএ বেশ চিকুর চামর কেশ

বান্ধএ কানড়ী খোপা লাস

নানা কুসুমিত জুতি দেখি চমকিত মতি

ঘন মধ্যে নক্ষত্র প্রকাশ।

নয়ন খঞ্জন তুল অঞ্জনে রঞ্জিত মূল

চঞ্চল চকোর সমুদিত।

.....

শীষেত সিন্দূর ভাস জেহ্ন রবি পরকাশ

মুখচন্দ্র জুতি সমুদিত।

শ্রবণে গুম্বিত মোতি রতন কুণ্ডল জুতি

তারা প্রভা জিনিয়া বিদিত।।[৫৫]

সুগন্ধি দ্রব্যের পরিচয় এ কাব্যে আমরা প্রত্যক্ষ করি। সুন্দর পোশাকে সজ্জিত হয়ে নারী, পুরুষ উভয়ে গায়ে গোলাপ জল, আতর ও চন্দন মেখে সুগন্ধ ছড়াত—

চন্দনে চর্চিত অঙ্গ কেশের সুগন্ধি সঙ্গ

জিনি তনু কান্তি সুশোভিত।।[৫৬]

চিত্র শিল্প নির্মাণ এবং চর্চার মাধ্যমে রুচিশীল সংস্কৃতিমনার পরিচয় পাওয়া যায়। সম্ভবত চিত্র শিল্প এবং শিল্পীর অভিজাত সম্প্রদায়ে খুব কদর ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

অভিজাত গৃহস্থের গৃহসজ্জার জন্য বিখ্যাত চিত্র শিল্পীকে আমন্ত্রণ জানানো হত। জোলেখার আদেশে সুবিখ্যাত চিত্র শিল্পী দিয়ে কামোদ্দীপক টঙ্গী নির্মাণ করা হয়–

কনক নির্মাণ ঘর চিত্র সারি বর্গ।
হীরামণি মাণিক্য জড়িত জেন স্বর্গ।।
কৌতর খঞ্জন পিক শুক সারী শিখী।
চকোয়া চাতকবর্গ রাজহংস পক্ষী।।
এসব মূরতী চিত্র লেখিয়া ইঙ্গিত।
মন্দির নির্মাণ নানা রঙ্গ সুচরিত।।[৫৭]

নৃত্যশিল্প চর্চা–

তাম্বুল যোগাএ কেহো, বিচিত্র চামরে
কেহো নৃত্য করে, কেহো বাহে কপিনাস।।[৫৮]

সঙ্গীত চর্চার উল্লেখ *জোলেখার গান* অংশে প্রত্যক্ষ করি–

(১) মুঞি কুলবতী সতী তোহ্মার চরণ গতি
করপুটে তোহ্মাত মিনতি।
তুহ্মি বিনে নাহি আর কত সৈমু দুক্ষভার
শুন মোর প্রাণপতি।[৫৯]

(২) সেই জন্মে তোহ্মা সঙ্গ থাকিব অনঙ্গ রঙ্গ
শুন মোর প্রাণপতি।
তবু না ছাড়িব তোহ্মা সঙ্গ।[৬০]

কন্যার সাথে যৌতুক হিসেবে দাসদাসী প্রেরণ করা হত–

সহস্রেক দাসী দিব চন্দ্র মুখ অভিনব
মণিমুক্তা অলঙকার পুর।[৬১]

Dhaka University Institutional Repository

যৌতুক হিসেবে নানা গৃহস্থালি তৈজস পত্র প্রদানের প্রচলন মধ্যযুগের কাব্যে প্রত্যক্ষ করা যায়–

কনকের বাটাবাটি বহু ভাণ্ড ঘট ঘটি
সুবিচিত্র ঝাড়ু গাড়ু বর্গ।
রতন প্রদীপ জ্যোতি সহস্র নক্ষত্র জিতি–
যেহেন উঝল মণি স্বর্গ।
ভাণ্ডারের ধন ভরি রতন কাঞ্চন পূরি
মণিময় আভরণ সাজ
মাণিক্য প্রবাল মোতি হীরামণি নানা ভাতি
মূল্য নাহি ভুবনের মাঝ।[৬২]

বিবাহানুষ্ঠানে মঙ্গল গীত–বাজানোর প্রচলন ছিল–

দুই রাজ বাদ্যবাজে জয় শঙ্খধ্বনি
বিবাহ মঙ্গল গাহে দেবের রমণী।[৬৩]

মঙ্গলাচরণ —

"ভট্ট সবে স্তুতি পঠে জুড়ি দুই কর
স্বামী বরদাতা শিব
তবে কন্যা মহেশ পূজিয়া ততক্ষণ"।[৬৪]

বিভিন্ন প্রকার পশুপাখির উল্লেখ আছে যেমন–

কৈতর খঞ্জন পিক শুক-শারী শিখী
চকোয়া চাতক বর্ণ রাজ হংস পাখী।[৬৫]

এর মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী শুক পাখি। 'বহুল পড়িছে শাস্ত্র জানে তত্ত্বসার।' কাব্যে শুক পাখি পত্র বাহকের ভূমিকা পালন করে—

পক্ষী বলে ইবিন আমিন কার নাম
সেহি আসি পত্র মোর নেউক এহি ঠাম।[৬৬]

Dhaka University Institutional Repository

শুক পাখি আমিনের কানে *গর্ন্ধব মহামন্ত্র* দিল বনি আমিন পক্ষীর ন্যায় নভোচারী হয়ে মধুপুর প্রত্যাবর্তন করলেন এবং ইউসুফের সাথে তার পূনর্মিলন হলো।

গর্ন্ধব শাস্ত্র মতে বিয়ের উল্লেখ আমরা প্রত্যক্ষ করি শাহবাল রাজপুরে। তাঁর একমাত্র কন্যা বিধুপ্রভা স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করার অনুরোধ করেন—

কুমারী আসিতে সভে আছিল হেরিআ।।
দেবতা গর্ন্ধব সবে চাহে কুতূহল।
গজপতি আইল বালা স্বয়ম্বর স্থল।।[৬৭]

এরপর বিধুপ্রভা স্বয়ম্বর সভায় প্রবেশ করে–

বিধুপ্রভাবতী আইল বিভা অনুভব।
হাথে পুষ্পমালা করি রাজার কুমারী।
ইবিন আমিন করে ত্রৈলোক্য সুন্দরী।
প্রণাম করিয়া পুষ্প মালা গলে দিল।
সখীগণে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল।।
জয় জয় শব্দ হৈল স্বয়ম্বর পুর।
দুহে দুহু দেখিয়া আনন্দমন ভোর।।[৬৮]

বনি আমিন ও বিধুপ্রভা সুখের বাসর রাত যাপন করেন–

পুষ্পক পালঙ্গী পরে দুহু প্রেম রস ভরে
সুখ শয্যা বাস নিরন্তর।[৬৯]

রাজ্য হস্তান্তর উপলক্ষে অভিষেক অনুষ্ঠানের বর্ণনা এ কাব্যে প্রত্যক্ষ করি। নরপতি শাহবাল অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করে জামাতাকে শুভক্ষণে রাজ্য দান করেন —

নানান তীর্থের জল আনি ঘট ভরি।
সুরভি দুগ্ধ আনি অভিষেক করি।।

Dhaka University Institutional Repository

পাত্র সভে বসাইল রাজ সিংহাসনে ।
চামর দোলাএ আসি জথ দেবগণে । ।
বিধুবতী ইবিন আমিন সঙ্গে করি ।
তান ঠাঁই সমর্পিল রাজ্য অধিকার । ।[৭০]

অতিথি ও গুরুজন বরণে নারীরা নানা শাস্ত্রাচার মেনে চলতেন—

কার হাতে দূর্বাধান নানা পুষ্প পাতা
নানা দ্রব্য সঙ্গে করি মঙ্গল বিধান ।
সর্বতনু বসনে ঢাকিয়া আঁখি মুখ ।[৭১]

রাজার যোদ্ধাবেশ —

সুসজ্জ করহ সৈন্য যথ অশ্ববর
সুবর্ণ কৃমিজি জিন চড়াঅ পাখর ।
বিশুদ্ধ সুবর্ণ মণি বিরচিত রথ.....
বিচিত্র কনক মণি কনক শোভিত ।[৭২]

অতিথি আপ্যায়ন ব্যবস্থা সর্বকালে স্বীকৃত। মধ্যযুগের আপ্যায়ন ব্যবস্থা বর্তমান যুগের মত ছিল না। সে যুগে সাধারণত তাম্বুল, কর্পূর, সুগন্ধি চন্দন এবং ফুল দিয়ে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হত—

ভৃঙ্গারের জল কোহ্ন সেবকে যোগাএ
চামর সমীর কেহো করে তান গাএ ।
সুবর্ণের বাটা ভরি কর্পূর তাম্বুল
সুগন্ধি চন্দন আদি নানা বর্ণ ফুল ।[৭৩]

শুভক্ষণে দধি, মধু ও ঘৃত দিয়ে মিষ্টিমুখ করানোর প্রচলন সব সময় সমাজে স্বীকৃত। তার প্রমাণ মেলে বাসর রাতে জোলেখা ইউসুফের মুখে মিষ্টি তুলে দেয়ার মধ্য দিয়ে—

Dhaka University Institutional Repository

কনক কটোরা ভরি মদুমিষ্ট সুখে
জলিখা তুলিয়া দেন্ত ইসুফক মুখে।
ঘৃত মধু শর্করা বহুল দুগ্ধ দধি।
সুধারসে পূরিত সন্দেশ নানা বিধি।[৭৪]

বিভিন্ন প্রকার খাট পালঙ্ক ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যায়—

ইউসুফক দিলা যথ খাট পাট পাটি
তুলি গাদি বসন ভূষণ বাটাবাটি।[৭৫]

শিশুদের ঘুমানোর জন্য দোলনা বা ঢুলনীর উল্লেখ এ কাব্যে প্রত্যক্ষ করি—

তার এক শিশু তিন মাসের সুন্দর
শয়ন করিয়া ছিল ঢুলনীর উপর।[৭৬]

গৃহ সামগ্রীর বর্ণনা : সুরম্য প্রাসাদ নানা কারুকাজ খচিত টঙ্গীর উল্লেখ এ কাব্যে বেশী পাই। এছাড়া জোলেখার কুঁড়ে ঘরের বর্ণনাও উক্ত কাব্যে পাওয়া যায়—

রচিলেন্ত এক টঙ্গী অন্তঃপুর থান
উষ্ণ দেবপুরী সম ফটিক নির্মাণ।
চন্দন আগর পাট শয্যা সুবলিত
স্তম্ভে স্তম্ভে রজত কাঞ্চন সুরচিত
চিত্রকারী বিচিত্র অক্ষর চমকিত
কাঞ্চনে রচিত বর জ্যোতি প্রদীপিত।
মধ্যে মধ্যে পাটাম্বর গুপ্ত ওড় আড়।
অতি মনোরম ভাতি মুকুতা সঞ্চার।
তার মাঝে মাণিক্য প্রবাল তারা জ্যোতি
দেবের বৈকুণ্ঠ কিবা অপরূপ ভাতি।[৭৭]

Dhaka University Institutional Repository

দাস দাসী কেনাবেচার নিয়ম ইউসুফ জোলেখা কাব্যে লক্ষ্য করি। তৎকালে আরব ও মিশর দেশে সন্তান লালন পালনের দায়িত্ব ধাত্রীদের উপর ন্যস্ত ছিল। ধাত্রী সমাজে কেনা বেচা হত। দুর্ভিক্ষের সময় সাধারণ মানুষ কেনাবেচার প্রচলন ছিল–

ভক্ষ্য দিয়া আক্ষা পুত্র-পরিজন
দাস-দাসী করিয়া রাখহ প্রাণ-ধন।
মিশ্রির সকল লোক হৈল দাস দাসী।[৭৮]

দ্রব্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে তামার ঢেপুয়া, মণিমুক্তা, রতন, হীরামাণিক্য, প্রবাল, চুনি প্রভৃতি মূল্যবোন ধাতু ও পাথর ব্যবহৃত হত–

(১) তামার ঢেপুয়া লহ এই মূল্য তার[৭৯]
(২) বহুল সুবর্ণ মণি রতন প্রবাল
হীরা নীলা মাণিক্য মুকুতা কসা লাল।
রত্ন মুকুতা প্রবাল হীরা চুনি মণি ধন।[৮০]

ইউসুফ জোলেখা কাব্যে ফুল ফলের যে বর্ণনা পাই তাতে বাংলাদেশের ফুল ফলের সাথে সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করি—

আম, জাম, নাগেশ্বর, লবঙ্গ গুলাল
চম্পা, যুথী, চামেলী গুলাল।[৮১]

তখনকার সমাজ বিবাহকে নারী পুরুষের মৃত্যু পর্যন্ত স্থায়ী বন্ধন হিসাবে গ্রহণ করত। বিবাহ বিচ্ছেদের কথা তারা চিন্তাও করত না–

শুন হে ইসুফ তুক্ষি হঅত তৎপর
জলিখা তোহ্মাক পত্নী জন্ম-জন্মান্তর।[৮২]

পুতুল নাচের উল্লেখ : তৎকালীন সময়ে বিনোদনের মাধ্যম হিসাবে পুতুল নাচের প্রচলন ছিল। উক্ত কাব্যে তারও নিদর্শন আছে–

পোতলা, নাচায় যেহ্ন সূতের সাতার
বাদিয়া আলোপে যেহ্ন সূত রাখি কর।[৮৩]

Dhaka University Institutional Repository

কোন মানুষই সমাজ সংস্কৃতির উর্ধ্বে নন। অমরত্বের সন্ধানে প্রত্যেক কবি সাহিত্যিক তাঁর সাহিত্যকর্মে স্বীয় কৃর্তির সংযোজন ঘটান এবং সাহিত্যকর্মে স্থান পায় সমাজ সংস্কৃতির বিচিত্র ধারা, যুক্ত হয় নিত্য নতুন বৈশিষ্ট্য। সমাজ সংস্কৃতি বর্ণনায় আলাওল পুরোপুরি বঙ্গীয়। তিনি সুদূর আরাকানে বসে কাব্য রচনা করলেও উপাদান সংগ্রহ করেছেন বাঙালি সমাজ হতে এ কারণে তাঁর *সতীময়না লোরচন্দ্রাণী* কাব্যে আমরা সপ্তদশ শতকের বাঙালি জীবনের রেখা চিত্রই ফুটে উঠতে দেখি।

মধ্যযুগে বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানমূলক কাব্যকাহিনী গুলো মূলত রাজরাজাদের কাহিনী নিয়ে রচিত। এ কারণে অভিজাত সমাজের পরিচয় এখানে বেশি পাওয়া যায়। *সতীময়না লোরচন্দ্রাণী* কাব্যগ্রন্থে এর ব্যত্যয় ঘটেনি। রাজা লোর, রাজপুত্র ছাতন, ধর্মবতী রাজ্যের রাজা উপেন্দ্র, রাজা মহিপাল সবাই সম্ভ্রান্ত এবং উচ্চবংশের অধিকারী। সামন্তজীবন চেতনা পরিলক্ষিত হলেও অত্যাচারের কোন ইঙ্গিত নেই। বরং রাজা লোর ছিলেন রূপে গুণে নারায়ণ—

লোরক রাজন রূপে নারায়ণ

.....

যথা তথা যায় বিজয় সদায়

নিশ্চিত যেন মুরারি।।[৮৪]

সাধারণ বৃত্তিজীবীর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কাঠুরিয়া, কুম্ভকার, দূতি, ধাত্রী, সাংবাদিক, ভিক্ষুক, ফকির, দরবেশ, জ্যোতিষী বা গণক। এসব সাধারণ মানুষ বিভিন্ন ভাবে সমাজে অবদান রাখে। কাঠুরিয়া রতনকলিকাকে আশ্রয় দিয়ে তাঁর জীবন রক্ষা করেছিল। রাণী ময়নার প্রেরিত ব্রাহ্মণ সারি পাখিসহ এক কুম্ভকারের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। দূতি মালিনী নানা কূটকৌশলের মধ্যদিয়ে ময়নাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। এ ধরনের দূতির উল্লেখ মধ্যযুগের প্রায় প্রতিটি রোমান্টিক কাব্যে পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

সম্ভবত সন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব সেকালে ধাত্রীর উপর অর্পন করা হত–

"ধাত্রি এক আনি দিলা দুগ্ধ পিয়াইতে ।"[৮৫]

এ কাব্যে আমরা দূতের আর এক পরিচয় পাই সাংবাদিক হিসেবে—

"নৃপতির সংবাদ শুনিয়া দ্বিজবর ।
সাংবাদিকে সঙ্গে লৈয়া চলিলা সত্বর । ।"[৮৬]

দূতের সাংবাদিক নামকরণের মধ্য দিয়ে কবির আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় ।

ভিক্ষুকের পরিচয় পাই রাজা লোর পুত্র সন্তানের জনক হওয়ার আনন্দে বহু দ্রব্যসামগ্রী দান করার মধ্য দিয়ে—

"তোষিলা বহুল দানে ভিক্ষুক সমাজে ।"[৮৭]

পীর দরবেশগণ ধর্মপ্রাণ আলীম হিসেবে পরিচিত ছিল—

"পরদেশী আলীম ফকির গুণবন্ত
ভক্ষ্যবস্ত্র দিয়া সদা সাদরে পোষেন্ত ।"[৮৮]

তৎকালীন সমাজে রাজা বাদশরা কাউকে ডাকার জন্য ডাকোয়াল নিয়োগ করতেন—

"হেনকালে নৃপতি ডাকোয়াল আসিয়া ।
বৃদ্ধসহ শিশুক লই গেল হাঙ্কারিয়া । ।"[৮৯]

সতীময়না লোরচন্দ্রাণী কাব্যে ঘটকের আর এক পরিচয় ভাট হিসেবে পাই—

"অনুমতি দিলা নৃপ ভাটের বিদিত
ভাটে বলে শীঘ্রে কর বিবাহের কাজ ।"[৯০]

Dhaka University Institutional Repository

দৈবজ্ঞ বা জ্যোতিষীর পরিচয় মধ্যযুগে প্রায় প্রতিটি কাব্যে লক্ষ্য করা যায়। সন্তানের ভাগ্য গণনা, যাত্রার শুভাশুভ নির্ণয়ে এদের কদর অপরিসীম।

সতীময়না লোরচন্দ্রাণী কাব্যগ্রন্থে সমাজ ও সংস্কৃতি বর্ণনার সুবিধার্থে আমরা সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর প্রতিটি পর্যায় ক্রমানুসারে আলোচনা করব—

গর্ভবতীকে পঞ্চম মাসে পঞ্চামৃত খাওয়ানোর উল্লেখ আছে। হিন্দু সমাজে সাত মাসে অমৃত খাওয়ানোর উল্লেখ এখনও বর্তমান আছে—

"এই মতে গর্ভ যদি পঞ্চ মাস হৈল।
উৎসব আনন্দে পঞ্চ অমৃত খাইল।"[৯১]

সন্তান ভুমিষ্ঠ হওয়ার পর জন্মোৎসব পালন করা হয়। সন্তানের ভাগ্য গণনা বা রাশিবর্গ বিচারের জন্য জোতিষীর আগমন ঘটে। প্রচণ্ডতপন এবং আনন্দব্রহ্মার জন্মের পর জ্যোতিষী নবজাতকের কোষ্ঠি গণনা ও জন্ম পত্রিকা প্রস্তুত করেন—

"অতি মহোৎসব বৃদ্ধে করিলা তখন।
জ্ঞাতি বন্ধু আমন্ত্রিয়া করিলা ভোজন।।"[৯২]

জ্যোতিষী আনন্দব্রহ্মার জন্মের পর রাশিবর্গ বিচার করেন—

"জ্যোতিষ আনিয়া রাশি বর্গ বিচারিলা
.....
কিন্তু পঞ্চদশ অব্দ হইলে নিকট
কুগ্রহ লাগিব কিছু পড়িব সঙ্কট।।
.....
ষোড়শ বৎসর ঘটিবেগ সুখভোগ
অস্ত্রে শস্ত্রে সুপারগ অতি নব কাম।
বিচারিয়া রাখিলা আনন্দবর্ধন নাম।"[৯৩]

Dhaka University Institutional Repository

রাজা লোরের পুত্র প্রচন্ডতপনের জন্মের পরও এ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেনি—

"গণকে গনিল রাশি বর্গ অতি ভাল ।
মোহা গুণবন্ত শিশু হৈব রাজ্যপাল ।"[৯৪]

সন্তানের বয়স পাঁচ বছর পূর্ণ হলে নানা শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য গুরুগৃহে পাঠানো হত। উচ্চবিত্ত বা রাজরাজারা গৃহ শিক্ষক রেখে সন্তানের শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করতেন—আনন্দব্রহ্মা ও প্রচন্ডতপনকে পাঁচ বছর বয়সে জ্ঞানার্জনের জন্য গুরুর কাছে পাঠানো হয়—

"পঞ্চম বৎসর যদি হইল কুমার
একবিপ্র পাইয়া দিলেক পঠীবার । ।"[৯৫]

রাজা লোর তাঁর পুত্র প্রচন্ডতপনকে ছাত্রশালায় পড়তে দিলেন—

"পঞ্চম বরিষে নৃপে দিলা ছত্রশালা ।"[৯৬]

সন্তানের বয়স বার বছর পূর্ণ হলে অস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হত— প্রচন্ডতপন ও আনন্দব্রহ্মাকে ধর্নুবান ও অস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হয়—

(১) দ্বাদশ বৎসরে হৈল অস্ত্রেশস্ত্রে ধীর ।[৯৭]

(২) "ধর্নুবাণ গদা খড়্গ অস্ত্রকলা যথ ।
অশ্ব গজ রথ রণ জানাইল সমস্ত ।"[৯৮]

শিকারে যাওয়া রাজা বাদশাদের একটি অন্যতম শখ হিসেবে বিবেচ্য ছিল। পঞ্চদশ বছর পূর্ণ হলে রাজপুত্ররা শিকারে যাওয়ার অনুমতি পেত—

"পঞ্চদশ অব্দ যদি হইল কুমার ।
একদিন চলিল মৃগয়া করিবার । ।"[৯৯]

শিকার করা বিনোদনের একটি অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বিবেচ্য ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

বিবাহের বর্ণনা সমাজে একটি আকর্ষণীয় বিষয় ছিল, যদিও *সতীময়না লোরচন্দ্রাণী* কাব্যে আড়ম্বরপূর্ণ বিবাহের বর্ণনা নেই। মদনমঞ্জরী এবং আনন্দব্রহ্মার বিয়ে হয়েছিল গর্ন্ধব শাস্ত্র মতে। চারিচক্ষুর মিলনের পর তারা গন্ধর্ব মতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়—

"এতেক শুনিয়া বালা ইষৎ হাসিয়া।
কুমারের গলে মালা দিলেক গাঁথিয়া।।
গন্ধর্ব বিধানে পতি বরিল কুমার।
দুই হস্ত জুড়িয়া করিল নমস্কার।।"[১০০]

কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকে গন্ধর্ব মতে বিবাহ প্রসঙ্গ বর্ণিত আছে। আলাওল বোধ হয় সংস্কৃত সাহিত্য হতে গন্ধর্ব মতে বিবাহের অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। লোরকপুত্র প্রচন্ডতপন এবং চন্দ্রপ্রভার বিয়ে সংক্ষিপ্ত হলেও কিছু জাঁকজমক বর্ণিত আছে। এই বিয়েতে শুভক্ষণ দেখা বিবাহের সজ্জা, অলঙ্কার, বাদ্যবাজনা এমনকি যৌতুক প্রদানের উল্লেখ আছে—

"শুভ যোগ হেন কর্ম হৈল উপস্থিত।
অনুমতি দিলা নৃপ ভাটের বিদিত।"[১০১]

সম্ভবত যে যুগের রাজপুত্ররা হস্তী বা ঘোড়ার পিঠে চড়ে বিবাহ করতে যেতেন—

"বিবাহের সজ্জা আদি বস্ত্র আভরণ,
হস্তী ঘোড়া পূর্ণ ঠাটে করিল গমন।।"[১০২]

প্রচন্ডতপন এবং চন্দ্রপ্রভার বিয়েতে যৌতুক প্রদানের উল্লেখ আছে—

"বহুল যৌতুক দিলা নৃপ সুদর্শন।
অর্দ্ধ রাজ্য দান দিলা দৈন্য হস্তী ঘোড়া
বহুল কাঞ্চন রত্ন বিবিধ কাপড়া।।"[১০৩]

Dhaka University Institutional Repository

প্রচন্ডতপনের বিয়ের বয়স দৃষ্টে মনে হয় তৎকালে সমাজে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল—

"শিশুকালে বিবাহ করাইলা মহারাজ ।
দোঁহ মনে শোক কে করিবে রাজ্য কাজ ।"[১০৪]

প্রচন্ডতপনের বিবাহের পর রাজা পুত্রের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান সাঙ্গ করেন—

"পুত্রেরে করিলা লোর রাজ্য অভিষেক ।"[১০৫]

লজ্জা নারীর ভূষণ এ প্রবাদটি সর্বজন স্বীকৃত। সেকালে সমাজে অবরোধ প্রথা না থাকলেও নারীরা আপন আপন সম্ভ্রম রক্ষা করে চলতেন। মদনমঞ্জরী পাতালপুরীতে আনন্দব্রহ্মার সম্মুখীন হলে "নেতাঞ্চলে মুখ ঢাকি বুলিলা সত্ত্বর।"[১০৬] তিনি স্বীয় আসন অভ্যাগতকে দিয়ে অন্তরাল থেকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকেন—"অভ্যান্তরে থাকিয়া লাগিল জিজ্ঞাসিতে।"[১০৭]

রাণী রতনকলিকা দীর্ঘসময় অন্তপুরে অপেক্ষার পর লজ্জা বিসর্জন দিয়ে পুত্রকে স্বচক্ষে দেখার জন্য বের হলেন—

মহাদেবী নিজপুত্র প্রত্যক্ষে দেখিয়া ।
সত্বরে বাহির হৈলা লজ্জা বিসর্জিয়া । ।[১০৮]

দীর্ঘ চৌদ্দ বছর পর রাজা লোরক ময়নার পাশে বসলে তিনি ঘোমটার মধ্যে আঁখি লুকাইলেন —

"ঘোমট ঘনের আড়ে লুকাইল আঁখি ।"[১০৯]

উচ্চস্বরে কথা বলা এবং কারণে অকারণে বিবাদ করা সব সময় সমাজে নিন্দনীয়। কাঠুরিয়া রতনকলিকাকে সঙ্গে নিয়ে আসছেন শুনে তার স্ত্রী কলহ বিবাদ শুরু করে। তখন কাঠুরিয়া ভৎর্সনা করে বলে—

"বেশ্যাপ্রায় কেন কর বিবাদের আশা ।"[১১০]

Dhaka University Institutional Repository

নারীকে সবসময় গৃহলক্ষ্মী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যে নারী যত বিনয়ী, সংযমী, প্রতিব্রতা, সহিষ্ণু, ধৈর্য্যশীলা সে সমাজে তত সমাদৃতা। নারীরা সবসময় গৃহকর্মে নিপুণ। সঞ্চয়ী বা মিতব্যয়ী হওয়া নারীর সুলক্ষণ বলে মনে করা হয়। প্রত্যেক নারীই হস্তশিল্পে পারদর্শী। ভাগ্য বিড়ম্বনায় রাজরাণী রতনকলিকাকে কাঠুরিয়ার গৃহে সূচী শিল্পের কাজ করতে হয়েছে—

"ক্ষেণে বস্ত্র সীয় ক্ষেণে দিব্য সুত কাটে।
পঞ্চ শত তঙ্কা বেঁচে প্রতি হাটে হাটে।।"[১১১]

গৃহস্থালি কাজকর্ম ছাড়াও সে যুগের মেয়েরা আনুষ্ঠানিক ব্রতকর্মে নিষ্ঠাবান ছিলেন। এরা সুগন্ধি দ্রব্য এবং অলঙ্কার পছন্দ করতেন না। অন্যের রন্ধন করা দ্রব্য এরা গ্রহণ করতেন না—

"কন্যা বলে আমি যদি সদা কষ্ট ব্রতমতী
কি কার্য সুগন্ধি আভরণ
.....
না ভক্ষিমু অন্যের রন্ধন।"[১১২]

আপ্যায়নের মাধ্যম হিসেবে তাম্বুল ছিল শীর্ষে—

"আপনে বসিয়া তুমি খাও গুয়াপান।"[১১৩]

রাজা লোরের সাথে পুর্নমিলনের সময় ময়নাবতী পান দিয়ে আপ্যায়ন করেছিলেন—

"দুঃখ কথা শুন আগে ভক্ষহ তাম্বুল।।"[১১৪]

খিলিপানের প্রতি আকর্ষণ বেশি ছিল—

"দেহ যদি এক খিলি পান।"[১১৫]

Dhaka University Institutional Repository

প্রসাধনের অংশ হিসেবে নারী সমাজে তাম্বুল জনপ্রিয় ছিল—

"তাম্বুলের রাগে কৈল্য অধর রাতুল।"[১১৬]

তৎকালীন সমাজের নারীরা সুগন্ধ কর্পূর যুক্ত গুয়াপান, মিষ্টি ও সন্দেশ পছন্দ করতেন। তাই সওদাগর রতনকলিকার সন্তুষ্টির জন্য নিম্নোক্ত দ্রব্য উপহার স্বরূপ দিয়েছিলেন—

"কর্পূর সম্ভোগ গুয়মা, কস্তুরী চন্দন চুয়া
মিষ্টক সন্দেশ উপহার।।"[১১৭]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে প্রেয়সী রাধিকার সন্তুষ্টির জন্য শ্রীকৃষ্ণ কর্পূর সংযুক্ত পান উপহার দিয়েছিলেন।

অলঙ্কারে আকর্ষণ সব সময় সমাজে প্রবল ছিল। প্রিয় সান্নিধ্যে যাবার পূর্বে নারীরা বিভিন্ন অলঙ্কার দিয়ে নিজেকে সজ্জিত করত। ময়নাবতীর সাজটিতে এর প্রমাণ মেলে—

"কম্বুকণ্ঠে শোভিত রচিত মুক্তাহার।
.....
রঞ্জিত কনক বাহু শোভে অতি ভাল।।
করেএ বলয়া রত্ন গুজরাটি চুড়ি।
.....
নেত কৌষেয় বস্ত্র দিল পিন্ধাইয়া।।"[১১৮]

প্রসাধন দ্রব্যের মধ্যে অন্যতম ছিল—কর্পূর, চন্দন, সিন্দুর, সুগন্ধি তৈল, কাজল প্রভৃতি। বিভিন্ন ফুল দিয়ে কবরী বাঁধা এবং মুক্তা দিয়ে কবরী সাজানোর উল্লেখ আছে—

"বান্ধিয়া কবরী দিল মালতীর মালা।
.....
তার চারিপাশে দিল মুকুতার ছড়া।"[১১৯]

Dhaka University Institutional Repository

সিঁথিতে সিন্দুর, সিন্দুরের মাঝে চন্দনের রেখা এবং চোখে কাজল দেওয়ার প্রচলন ছিল—

"দুইভাগ করি কেশ রচিল সীমন্ত ।

.....

সুরঙ্গ সিন্দুর মাঝে চন্দনের রেখা ।

.....

খঞ্জন গঞ্জিত আঁখি রঞ্জিত কাজলে । ।"[১২০]

কিন্তু *সতীময়না লোরচন্দ্রাণী* কাব্যে পুরুষের অলঙ্কার ব্যবহারের বর্ণনা নেই । বসন ভুষণের তেমন উল্লেখযোগ্য তালিকাও পাওয়া যায়নি তবে মেয়েরা সূক্ষ্ম নেতবস্ত্র শিরে পরিধান করত —

"নেত কৌষেয় বস্ত্র দিল পিন্ধাইয়া ।"[১২১]

অবস্থাসম্পন্ন বা সম্ভ্রান্ত পরিবারের পুরুষেরা মাথায় পাগড়ী পড়ত—

(১) "ফেলিয়া শিরের পাগ কান্দএ (সওদাগর) বসিয়া ।"[১২২]

(২) "শির হন্তে কুমারে বসন খসাইয়া ।

পৃষ্ঠে করি তিন বস্ত্র লৈলা বান্ধিয়া ।"[১২৩]

সতীময়না লোরচন্দ্রাণী কাব্যে ফলের উল্লেখ নেই । কিন্তু ফুলের বর্ণনা আছে । কুন্দ, মালতী, পদ্ম, কিংশুক প্রভৃতি ফুলের তালিকা পাই । খাবারের তেমন উল্লেখযোগ্য তালিকা নেই তবে রতনকলিকার মাঞ্জসে 'তন্ডুল' জাতীয় এক প্রকার খাবার দেয়া হয়েছিল—

'তন্তুল ইন্ধন আদি হেঁটভাগে থুইলা ।"[১২৪]

আনন্দব্রহ্মাকে খাওয়ানোর জন্য রতকলিকা বিভিন্ন ব্যঞ্জনসহ ভাত নিয়ে কারাগারে যায়—

"বুলিলা জননী প্রাণ উঠি খাও ভাত ।"[১২৫]

Dhaka University Institutional Repository

রতনকলিকা পুত্রকে উপহারস্বরূপ নিয়মিত পিষ্টক পাঠাত—

"উপহার পিষ্টক পাঠায় নিত্য নিত ।"[১২৬]

এই কাব্যে নিত্য ব্যবহার্য কিছু সাধারণ অথচ গুরুত্বপূর্ণ গৃহস্থালি জিনিসপত্রের পরিচয় পাওয়া যায়—

(১) খাট ঃ শয্যার উপকরণ—

"মধ্যভাগে খাট শয্যা কৈলা রহিবার"[১২৭]

(২) আসন ঃ বসার একটি উপকরণ বিশেষ—

"বসিতে আসন দিলা না বসিল রাণী ।"[১২৮]

(৩) চান্দোয়া ঃ সম্মানিত কোন ব্যক্তি যদি কোন সভা, সমিতিতে যান তখন তার আসনের উপর চান্দোয়া টাঙানো হয়—

"নৃপতিরে আনি যোগ্য স্থানেতে বসাও ।
মধ্যভাগে সুবিচিত্র চান্দোয়া টাঙ্গাও । ।"[১২৯]

(৪) মশারি ঃ মশার উপদ্রব হতে রক্ষা পাবার জন্য নির্মিত একটি উপকরণ—

"চন্দ্রাণী মশারী ফেলি আপনার হাতে ।"[১৩০]

(৫) ছুরি ঃ কোন দ্রব্য (মাংস, ফল) কাটিবার যন্ত্র বিশেষ—

"দেখিয়া কুমারে করে তীক্ষ্ণ ছুরি লইয়া ।
মাংস কাটি দোঁহ আগে দিল ফেলাইয়া । ।"[১৩১]

(৬) কাটারী ঃ দা জাতীয় এক প্রকার কাটার যন্ত্র—

"এ বুলি কাটারী করে লৈল মারিবার তরে
দেখি সাদু হৈল ত্রাস মন । ।"[১৩২]

Dhaka University Institutional Repository

(৭) বিচনী ঃ পাখা জাতীয় বাতাস বা হাওয়া নেয়ার উপকরণ—

(ক) "ব্যজনী ব্যজিয়া শীঘ্রে শুখাইয়া কেশ ।[১৩৩]

(খ) "ব্যজনী ব্যজিয়া পৃষ্ঠে বুলাইল হাত ।"[১৩৪]

(৮) ঘটঃ কোন শুভ কর্মে পূর্ণ ঘট মঙ্গল চিহ্নের প্রতীক মনে করা হত—

"পূর্ণ ঘট আগে লৈয়া সখী সম্বলিত ।
অষ্টাঙ্গে প্রণমি ময়না হৈলা একভিত । ।"[১৩৫]

সতীময়না লোরচন্দ্রাণী কাব্যে বর্ণিত যানবাহনের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ডিঙ্গা, বহিত্র, নৌকা, মাঞ্জস প্রভৃতি—

(১) "ডিঙ্গাতে উঠিয়া যদি তুলিল লঙ্গর ।
না চলে বহিত্র বাও বহে খরতর । ।
নৌকাতে বান্দিয়া ডিঙ্গা বহুল টানিল ।"[১৩৬]

(২) "মাঞ্জসে উঠিলা কর্ম নিয়োজিত জানি ।"[১৩৭]

বিত্তশালীরা দোলা বা চতুর্দোলা ব্যবহার করত—

(১) 'প্রভাতে দোলাতে চড়ি কুমারী চলিলা"[১৩৮]

(২) "চতুর্দ্দোলে করি কন্যা লই গেল ঘরে"[১৩৯]

সতীময়না লোরচন্দ্রাণী কাব্যে শ্বেতপাথর খচিত বা হেমরত্ন বিরাজিত রাজপ্রসাাদের উল্লেখ না থাকলে 'টঙ্গী' নামে প্রাসাদের উল্লেখ আছে—

(১) "কন্যার বচনে শীঘ্রে টঙ্গিতে উঠিলা ।"[১৪০]

কোন শুভ সংবাদ প্রাপ্তির পর মিষ্টি মুখ করানোর প্রচলন সমাজে সব সময় স্বীকৃত । উক্ত কাব্যে এর ব্যতিক্রম ঘটেনি—

"স্নান করি মিষ্টফল ভক্ষিলা কৌতুকে ।"[১৪১]

Dhaka University Institutional Repository

স্নানের একটি মনোরম বর্ণনা আমরা এ কাব্যে প্রত্যক্ষ করি যার মধ্য দিয়ে বাঙালি সমাজের বাস্তব চিত্রের প্রতিফলন ঘটেছে—

"এ বলিয়া ময়না লই গেলা স্নান স্থল।
সখিগণে আনিয়া সুগন্ধি দিব্য জল।।
.....
মাজিয়া চিকুর অঙ্গ জল দিল মাথে।।
.....
ব্যজনী ব্যজিয়া শীঘ্রে শুখাইল কেশ।"[১৪২]

তৎকালীন সমাজে বর্ণ বৈষম্য ছিল বলে মনে হয় না। কারণ উচ্চ বংশোদ্ভুত ব্রাহ্মণ কুম্ভকারের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন।

মদনমঞ্জরীর পাশা–দুলিচা ইত্যাদি বর্ণনা হতে মনে হয় সেকালে পাশা খেলা বেশ জনপ্রিয় ছিল।

নায়িকার বারমাসী বর্ণনার মধ্য দিয়ে বাঙালি গৃহবধূর অন্তর্বেদনাকে তুলে ধরার প্রয়াস মধ্যযুগের প্রায় প্রতিটি রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানমূলক কাব্যে প্রত্যক্ষ করি। আলোচ্য *সতীময়না লোরচন্দ্রাণী* কাব্যে কবি ময়নাবতীর বারমাসী বর্ণনার মধ্যদিয়ে আবহমান বাঙালি বধূর অন্তর্জ্বালা প্রকাশ করেছেন। ময়নাবতী ছিলেন পতিব্রতা নারী। স্বামী লোর তাকে ত্যাগ করলেও স্বামীর মঙ্গল চিন্তায় সে হরগৌরীর আরাধনায় অহর্নিশি মগ্ন। তার এ অটল সত্যে আঘাত হানার চেষ্টা করে ছাতন প্রেরিত দূতি মালিনী। কিন্তু দূতির কুপরামর্শ ময়নাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারেনি। এখানেই নারীর মহত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

সতীময়না লোরচন্দ্রাণী কাব্যে বারমাস্যা আষাঢ় মাস হতে শুরু হয়েছে। "প্রাচীন ভারতীয় কাব্য ঐতিহ্যে আষাঢ় মাসের বিশেষত্ব রয়েছে।"[১৪৩] সম্ভবত আষাঢ় মাসের মেঘের ঘনঘটা বিরহিনীর বুকে জাগিয়ে তোলে বিরহের উন্মাদনা। মানুষ থাকে কর্মহীন পরস্পরের সান্নিধ্যে আসার সময়

Dhaka University Institutional Repository

পাই বেশি। মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূতম্' কাব্যে- আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে নির্বাসিত যক্ষের অন্তরে বিরহ গুমরে উঠে। কালিদাসের প্রভাব দৌলত কাজীর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব ও ময়নার বারমাসীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করি।

দৌলত কাজীর 'বারমাসী'টি অন্যান্য গতানুগতিক বারমাসী'র বর্ণিত নায়িকার খেদোক্তি নয়, এখানে ময়নাবতীর অদ্ভুত আত্মিক শক্তি ও প্রলোভনবিজয়ী অটল হৃদয়ের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। সে কামদেবের হাতে ক্রীড়ার পুতুল নয়। স্থূল জীবন ভোগের বিরুদ্ধে সে প্রতিবাদী, আদর্শবাদ প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় সংকল্প। ময়নাবতীর এই চারিত্রিক দৃঢ়তায় বৈষ্ণব কবি স্বভাবের শুচিশুভ্র পবিত্রতাও রক্ষিত হয়েছে। রাধাকৃষ্ণের ভগবৎ প্রেমকে অবলম্বন না করে বাংলা ভাষায় ব্রজবুলি ব্যবহার করে মানব মানবীর প্রেমের সজীব চিত্র অঙ্কন করা যায়। দৌলত কাজী তা প্রমাণ করতে পেরেছেন।[১৪৪]

আলাওল দৌলত কাজীর অসমাপ্ত ময়নাবতীর বারমাসীর জ্যৈষ্ঠমাসের দুঃখ দুর্দশার চিত্র অঙ্কন করেছেন। মালিনী নানা প্রলোভন দেখিয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে পতি বিচ্ছেদরতা বিরহিনীর হৃদয়ের তুলনা করে ময়নাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। বারমাসীতে সাধারণত পতিবিচ্ছেরতা রমণীর অন্তর্বেদনা তুলে ধরা হয়।

"সতীময়না লোরচন্দ্রাণী" কাব্যে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে যাত্রার শুভাশুভ নির্ণয়ে জ্যোতিষীর শরণাপন্ন হওয়া এবং সতীদাহ প্রথার উল্লেখ। রাজা লোর স্বদেশে আগমনের প্রাক্কালে জ্যোতিষী নিম্নোক্ত বিধান দেন—

শুভদিন লগ্ন করি দিল চলিবার।
উত্তরে সিদ্ধান্তে আদেশিল গুরুভার।।"[১৪৫]

Dhaka University Institutional Repository

বৃদ্ধ বয়সে রাজা যখন রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন তখন দুই রাণী মৃত স্বামীর চিতায় স্বেচ্ছায় আত্মাহুতি দিয়ে সতীত্ব প্রমাণ করেন। বিষাদের মধ্য দিয়ে কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে—

"ব্যাধি হৈয়া মৈল শেষে লোর নরপতি।
সেই চিতা প্রবেশি চলিলা দুই সতী।"[১৪৬]

"দৌলত কাজী ও আলাওল দু'জনেই সূফী ধর্মাবলম্বী কবি। দু'জনেই ছিলেন মর্ত্য জীবনরসিক। সুফী প্রেম-ধর্মের স্বভাববশত কাব্যের মানবিক আবেদনকে তাঁরা অধ্যাত্মলোকে উন্নীত করেননি, মর্ত্যলোকের জীবনরসে রসায়িত করেছেন।"[১৪৭]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জি

১। ওয়াকিল আহমদ, বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, ঢাকা, ২০০১ (৫ম সংস্করণ), পৃষ্ঠা–১৪৬।

২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১৪৬।

৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১৪৭।

৪। শাহমুহাম্মদ সগীর বিরচিত–*ইউসুফ জোলেখা* সম্পাদক ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা-৯৫ (কাহিনী সংক্ষেপ অংশ)।

৫। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৯৭।

৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১০২।

৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১০৫-১০৬।

৮। আলাওল বিরচিত–*সতী-ময়না লোর-চন্দ্রাণী* সম্পাদক মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা–১৯৯২, পৃষ্ঠা–৬ (ভূমিকা অংশ)।

৯। ডক্টর আহমদ শরীফ, মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, ঢাকা, মুক্তধারা, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা–২৭৪-২৭৫।

১০। সুকুমার সেন, ইসলামি বাংলা সাহিত্যে, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, ১৩৮০, (২য় সংস্করণ), পৃষ্ঠা–১০১।

১১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১০২।

১২। ডক্টর আহমদ শরীফ, মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, ঢাকা, মুক্তধারা, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা–২৭৫।

১৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২৭৫।

১৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২৬৫।

১৫। সুকুমার সেন, ইসলামি বাংলা সাহিত্যে, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, ১৩৮০, (২য় সংস্করণ), পৃষ্ঠা–১০১।

১৬। ডক্টর আহমদ শরীফ, মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, ঢাকা, মুক্তধারা, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা–২৬৪।

১৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২৬৪-২৬৫।

১৮। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২৬৫।

১৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২৬৬।

২০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২৬৫।

২১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

২২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২৬৫।

২৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২৬৭।

২৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২৬৭।

২৫। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২৬৭।

২৬। ডক্টর রাজিয়া সুলতানা, সাহিত্য-বীক্ষণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা–২০।

২৭। ডক্টর আহমদ শরীফ, মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, ঢাকা, মুক্তধারা, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা–২৬৭।

২৮। ডক্টর রাজিয়া সুলতানা, সাহিত্য-বীক্ষণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা–১০।

২৯। ডক্টর আহমদ শরীফ, মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, ঢাকা, মুক্তধারা, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা–২৬৮।

৩০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২৬৮।

৩১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২৬৮।

৩২। ডক্টর রাজিয়া সুলতানা, সাহিত্য-বীক্ষণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা–১১।

৩৩। ডক্টর আহমদ শরীফ, মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, ঢাকা, মুক্তধারা, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা–২৬৯।

৩৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২৬৯।

৩৫। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২৬৯।

৩৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২৭০।

৩৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২৭০।

৩৮। শাহমুহাম্মদ সগীর বিরচিত–ইউসুফ *জোলেখা* সম্পাদক ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা-৪-৫।

৩৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১।

৪০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২।

৪১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৩।

৪২। ডক্টর আহমদ শরীফ, মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, ঢাকা, মুক্তধারা, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা–২১১।

৪৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২১৪।

৪৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২১৪।

৪৫। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২১৪।

৪৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২১৪।

Dhaka University Institutional Repository

৪৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা—২১৪।

৪৮। শাহমুহাম্মদ সগীর বিরচিত—ইউসুফ *জোলেখা* সম্পাদক ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা-৪০।

৪৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা—৩৬।

৫০। ডক্টর আহমদ শরীফ, মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, ঢাকা, মুক্তধারা, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা—২১৩।

৫১। শাহমুহাম্মদ সগীর বিরচিত—ইউসুফ *জোলেখা* সম্পাদক ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা-৪৯।

৫২। ডক্টর আহমদ শরীফ, বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য (১ম খন্ড), বর্ণ মিছিল, ঢাকা, ১৯৭৮, পৃষ্ঠা—৩৪৬।

৫৩। শাহমুহাম্মদ সগীর বিরচিত—ইউসুফ *জোলেখা* সম্পাদক ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা-৫২-৫৫।

৫৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা—১০০।

৫৫। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা—৯৯—১০০।

৫৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা—১০০।

৫৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা—৯৭।

৫৮। ডক্টর আহমদ শরীফ, মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, ঢাকা, মুক্তধারা, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা—২১২।

৫৯। শাহমুহাম্মদ সগীর বিরচিত—ইউসুফ *জোলেখা* সম্পাদক ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা-১০৮।

৬০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা—১০৯।

৬১। ডক্টর আহমদ শরীফ, মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, ঢাকা, মুক্তধারা, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা—২১২।

৬২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা—২১২।

৬৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা—২১৭।

৬৪। ডক্টর আহমদ শরীফ, বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য (১ম খন্ড), বর্ণ মিছিল, ঢাকা, ১৯৭৮, পৃষ্ঠা—৩৬২।

৬৫। ডক্টর আহমদ শরীফ, মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, ঢাকা, মুক্তধারা, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা—২১৫।

৬৬। শাহমুহাম্মদ সগীর বিরচিত—ইউসুফ *জোলেখা* সম্পাদক ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা-২২২।

৬৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা—২৩০।

৬৮। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা—২৩০।

Dhaka University Institutional Repository

৬৯। ডক্টর আহমদ শরীফ, মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, ঢাকা, মুক্তধারা, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা–২১৭।

৭০। শাহমুহাম্মদ সগীর বিরচিত–*ইউসুফ জোলেখা* সম্পাদক ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা-২৩৩।

৭১। ডক্টর আহমদ শরীফ, বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য (১ম খন্ড), বর্ণ মিছিল, ঢাকা, ১৯৭৮, পৃষ্ঠা–৩৬২।

৭২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৩৬২।

৭৩। ডক্টর আহমদ শরীফ, মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, ঢাকা, মুক্তধারা, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা–২১৯।

৭৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২১৫।

৭৫। ডক্টর আহমদ শরীফ, বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য (১ম খন্ড), বর্ণ মিছিল, ঢাকা, ১৯৭৮, পৃষ্ঠা–৩৫৮।

৭৬। ডক্টর আহমদ শরীফ, মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, ঢাকা, মুক্তধারা, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা–২১৬।

৭৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২১৮।

৭৮। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২১৮।

৭৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২১৫।

৮০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২১৫।

৮১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২১৪।

৮২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২১৬।

৮৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২১৬।

৮৪। অমৃতলাল বালা, আলাওলের কাব্যে হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯১, পৃষ্ঠা–২৮১।

৮৫। আলাওল বিরচিত–*সতী-ময়না লোর-চন্দ্রাণী* সম্পাদক মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা–১৯৯২, পৃষ্ঠা–৩৮।

৮৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৯৫।

৮৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৩৪। (কবির কাব্যে সমাজ প্রসঙ্গ)

৮৮। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৩৪। (কবির কাব্যে সমাজ প্রসঙ্গ)

৮৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৩৪। (কবির কাব্যে সমাজ প্রসঙ্গ)

৯০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১১০।

৯১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৩৭।

৯২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৩৭।

৯৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৩৭-৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

৯৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৯১।

৯৫। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৩৮।

৯৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৯১।

৯৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৯১।

৯৮। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৩৮।

৯৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৩৮।

১০০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৬৪।

১০১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১১০।

১০২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১১০।

১০৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১১১।

১০৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১১২।

১০৫। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১১১।

১০৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৬১।

১০৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৬২।

১০৮। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৮৮।

404177

১০৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১১৬।

১১০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৩৬।

১১১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৩৭।

১১২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৫১।

১১৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১১৯।

১১৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১২১।

১১৫। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৩১। (কবির কাব্যে সমাজ প্রসঙ্গ)

১১৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১১৯।

১১৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৫১।

১১৮। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১১৯-১২০।

১১৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১১৯।

১২০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১১৯।

১২১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১২০।

১২২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৩১ (কবির কাব্যে সমাজ প্রসঙ্গ)

১২৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৩১ (কবির কাব্যে সমাজ প্রসঙ্গ)

১২৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২৯।

১২৫। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৪০।

Dhaka University Institutional Repository

১২৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৪৪।

১২৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২৯।

১২৮। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১১৭।

১২৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৮২।

১৩০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১২১।

১৩১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৭৮

১৩২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৫৩।

১৩৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১১৯।

১৩৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১২৪।

১৩৫। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১১৬।

১৩৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৪৫।

১৩৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৩০।

১৩৮। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৪৯।

১৩৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৫৬।

১৪০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৬১।

১৪১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৬৪।

১৪২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১১৯।

১৪৩। অমৃতলাল বালা, আলাওলের কাব্যে হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা–১৯৯১, পৃষ্ঠা–২৮৮।

১৪৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২৮৯।

১৪৫। আলাওল বিরচিত–*সতী-ময়না লোর-চন্দ্রাণী* সম্পাদক মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা–১৯৯২, পৃষ্ঠা–১১২।

১৪৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১২৫।

১৪৭। অমৃতলাল বালা, আলাওলের কাব্যে হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা–১৯৯১, পৃষ্ঠা–৩০১।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

পদ্মাবতী কাব্যের সমাজ ও সংস্কৃতি

Dhaka University Institutional Repository

যে কোন মহৎ ও সৃজনশীল শিল্পকর্ম হচ্ছে সময় সাপেক্ষ। যেহেতু একজন কবি, সাহিত্যিক কিংবা ঔপন্যাসিক সামাজিক মানুষ সেহেতু তাঁর শিল্পকর্মে তৎকালীন সামাজিক রীতিনীতি, আচারআচরণ, প্রথা, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ, নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হবে এটাই স্বাভাবিক। আলাওল (১৫৯৭–১৬৭৩) মধ্যযুগের সপ্তদশ শতকের প্রধান কবি এবং সমগ্র মধ্যযুগের কাব্যপ্রবাহে আলাওলের বিশিষ্টতা ও প্রাধান্য নির্ধারিত এবং স্বীকৃত। আলাওল বর্ণিত *পদ্মাবতী* কাব্যের সমাজ ও সংস্কৃতি তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থারই ইঙ্গিত বহন করে।

আরাকান রাজসভায় সতের শতকের মুসলমান কবিরা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবে দেবদেবী নির্ভর অলৌকিক শক্তিতে, বিশ্বাসে পরিপুষ্ট কাব্য ও সাহিত্য নির্মাণের যুগে রোসাঙ্গের কবি কাজী দৌলত উজীর, সৈয়দ আলাওল, কোরেশী মাগন ঠাকুর, মরদন, আব্দুল করিম খোন্দকার কাব্যসাধনার দ্বারা বাংলা সাহিত্যে এক নব দিগন্তের দ্বার উন্মোচন করেন। ধর্মনির্ভর সাহিত্য নয়, বরং প্রেমের পথে মানব হৃদয়ের রোমান্স, চাঞ্চল্য ও আর্তির বিচিত্র লীলায় ধর্মনিরপেক্ষ কাব্যগুলি হয়ে উঠেছে বিকশিত। বস্তুত আরাকান রাজসভায় মুসলমান কবিদের লেখা এ সব প্রেমের কাহিনী কাব্যগুলি বিশুদ্ধ মানব প্রেমের কাহিনীর উপরই প্রতিষ্ঠিত। বৈষ্ণব পদাবলী, মঙ্গলকাব্যসাহিত্য ও শ্রীচৈতন্য প্রভাবান্বিত চরিত্র সাহিত্যের দেবতা বা দেবোত্তম মানুষের চরিত্রাঙ্কন নয় বরং এই মর্ত্যলোকের মানুষের সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্না, বেদনা বিধুর হৃদয়ের আর্তি নিয়ে রচিত সাহিত্য নির্মাণে ব্রতী হয়েছিলেন কবি আলাওল। বাংলা সাহিত্যে ধর্মনিরপেক্ষ কাহিনী কাব্যের সূত্রপাতে যেহেতু তাঁরা অগ্রণী এবং যেহেতু তাঁদের কাব্যগুলি কবিত্বের কষ্টিপাথরে উচ্চ শ্রেণীর, সে কারণে তাঁরা এ শাখার 'যুগ প্রবর্তক' কবি— এ সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত থাকবেন নিঃসন্দেহে।

Dhaka University Institutional Repository

মালিক মুহম্মদ জায়সীর *পদমাবৎ* (১৫৪০ খ্রি.) কাব্যটি রচনার শতবর্ষ পরে *পদ্মাবতী* কাব্যটি আলাওল কর্তৃক অনূদিত হয়। এই একশ বছরে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি।

আলাওল নিজেই ছিলেন অভিজাত সামন্তসমাজের একজন প্রতিনিধি। তাই সামন্ত রক্তস্রোত তাঁর ধমনীতে প্রবাহিত ছিল। আলাওলের পিতা ছিলেন ফতেহাবাদের সামন্তশাসক মজলিস কুতুবের অমাত্য। মজলিস কুতুব ছিলেন প্রথমে স্বাধীন কিন্তু পরে তিনি জায়গীরদারে পরিণত হন। আলাওলের বাল্যজীবন অতিবাহিত হয় পিতার সাহচার্যে সম্ভ্রান্ত সামন্ত পরিবেশে। কবির বাল্যশিক্ষাও সমাপ্ত হয় সামন্ত পরিবেশে। তরুণ বয়সেই কবি পিতার সাথে হার্মাদ বা পর্তুগীজ মগজলদস্যুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেন এবং রণক্ষত হয়ে বন্দি হন। সে যুগে অস্ত্র ধরা সামন্ত শ্রেণীর জন্য অত্যাবশ্যক ছিল। আলাওল নিজেই মজলিস কুতুবকে রাজেশ্বর আখ্যায়িত করেছেন। কবির পরবর্তী জীবন অতিবাহিত হয় আরাকানের রাজধানী রোসাঙ্গে। প্রথমে তিনি নিযুক্ত হন মগরাজার দেহরক্ষী, অতঃপর মহান্তের গৃহে নাট ও সঙ্গীতের শিক্ষক। এরপর তিনি অমাত্য সভার সভাকবি নিয়োজিত হন। একে একে তিনি প্রধানমন্ত্রী মাগন ঠাকুর, সোলায়মান, সৈন্য মন্ত্রী মোহাম্মদ খান, রাজমহান্ত সৈয়দ মুসা ও মহামাত্য মজলিস কুতুবের স্নেহভাজন লাভ করে, ত্রিশ বছর এঁদের সান্নিধ্যে থেকে ছয়খানি কাব্য রচনা করেন। তারপর বৃদ্ধ বয়সে কবি ইহলোক ত্যাগ করেন। সুতরাং আমরা কবির যে জীবন প্যাটার্ন প্রত্যক্ষ করি তাতে তিনি পুরো জীবন অতিবাহিত করেন নগরের উচ্চবর্গের সংস্পর্শে এবং অভিজ্ঞতা লাভ করেন সামন্ত জীবনের বিচিত্র ধারায়। মুঘল সুবেদার ইসলাম খানের ফতেয়াবাদ আগমন, মজলিস কুতুবের পরাজয়, হার্মাদ দস্যুর সাথে কবিপিতার যুদ্ধ এবং মৃত্যু, মগরাজার অন্তর্বিদ্রোহ, রাজা ও রাজপুত্রের অভিষেক, রোসাঙ্গে শাহ সুজার আশ্রয় গ্রহণ, বিদ্রোহ এবং সপরিবারে ধ্বংস, মগ-মুঘলে সীমান্ত যুদ্ধ, রাজপুরুষের নৌবিহার ইত্যাদি ঐতিহাসিক ঘটনা ও সামন্ত জীবননাট্য কবি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন। শক্তি, বীর্য, সম্পদ, ঐশ্বর্য, বিলাসিতা, ভোগ এ জীবনের বৈশিষ্ট্য। আলাওল

Dhaka University Institutional Repository

আত্মকথায় ও রাজ প্রশস্তিতে রাজপুরুষের যে চিত্র অংকন করেন তাতে তাঁর মূল্যবোধ ও সমকালীন জীবনের চিত্রই প্রকাশিত হয়েছে।

আলাওলের কাব্যে সামন্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে কয়েকজন ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাই যাঁদের জীবন যাত্রা, ভোগ বিলাস ও চালচলন সামন্ত সমাজের ইঙ্গিত দেয়। সামন্ত শ্রেণীর অন্তরালে সাধারণ বৃত্তিজীবী মানুষের পরিচয়ও আমরা পদ্মাবতী কাব্যে পেয়ে থাকি।

সামন্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেন কোরেশী মাগন ঠাকুর। তিনি রোসাঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি উচ্চ কুলোদ্ভব ও সত্যবাদী জীতেন্দ্রিয় ছিলেন। তাঁর পিতা আরাকানের সৈন্যমন্ত্রী ছিলেন। "নিজ গুণে পাইছিলা বাপের বিষয়"।[১] সুযোগ্য পুত্র বিধায় পিতার পদ অলঙ্কৃত করেন। পরবর্তীতে মগরাজ তার গুণের স্বীকৃতিতে রাজ কুমারীর অভিভাবক নিযুক্ত করে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব দেন। মাগন ঠাকুর জ্ঞানে, প্রজ্ঞায় যেমন ছিলেন অনন্য তেমনি রাজকৃত্যে প্রশংসনীয়। তিনি একদিকে যেমন ছিলেন একজন সফল সামন্ত শাসক অন্যদিকে তেমনি একজন ভাষাজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, রুচিবোধ ও শিল্পজ্ঞান সম্পন্ন সামাজিক মানুষ। তিনি সাধারণ মানুষের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী। গুণিকে পুরস্কৃত, দুঃস্থ ও দরিদ্রকে দান করা ছিল তাঁর ঋজু অভ্যাস। এ থেকে সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর মমত্ববোধ ও সহমর্মিতা প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং অনুমান করা যায় যে, সে যুগের সামন্ত শাসকরা অত্যাচারী ছিলেন না বরং সকলকে নিয়ে একটি সুখী সমৃদ্ধ সমাজ গঠনই ছিল তাঁদের ব্রত—

দেব-গুরু-ভক্ত মিত্র—বান্ধব পালক।
ইঙ্গিতে বাঞ্ছিত পুরে তোষন্ত যাচক।।
দান কালে শত্রু মিত্র এক নাহি চিন।
সকলেরে দেন্ত নিত্য আপ্ত কিবা ভিন।।
শুদ্ধভাব সদাচার মধুর আলাপ।
না জানন্ত কৃপণতা অকর্মকলাপ।।

.....

Dhaka University Institutional Repository

মহাদানী মহামানী মহা সাহসিক।
অহিংসক আপ্তশূন্য মর্যাদা অধিক।।
যেই কিছু নিরঞ্জন কহিছে পুরাণে।
সেই কর্ম নিত্য করে আন নাহি মনে।।[২]

শ্রীমন্ত সোলায়মান নিজেও একজন সামন্ত। কবির চোখে তিনি মহাগুণী ও সত্যে রত্নাকর। তিনি গুণীকে "অন্ন বস্ত্র দানে নিত্য পোষন্ত সাদরে।"[৩] এ থেকে স্পষ্ট যে, সামন্ত শাসকরা যোগ্যতা অনুসারে সকলকে সমাদর করতেন।

সৈন্য মন্ত্রী সৈয়দ মহাম্মদ খান সম্পর্কে কবির মন্তব্য—

নানা শাস্ত্র পারগ বিদ্বান বিদগধ।
আরবী ফারসী আর হিন্দুয়ানী মগধ।।
মোহন্ত সঙ্গীত জ্ঞাতা ভাব রসে লীন।
রাগ রঙ্গে বিনোদ থাকন্ত নিশিদিন।।[৪]

উপরের মন্তব্য থেকে তৎকালীন সমাজে সঙ্গীত চর্চার একটি চিত্র পাই। নানা শাস্ত্র ও সঙ্গীত চর্চার মধ্য দিয়ে তাঁরা অবসর সময় কাটাতেন। নানা শাস্ত্র ও ভাষা সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞান এবং সঙ্গীতে অনুরাগ দেখে তাঁদের উন্নত রুচিবোধ ও সংস্কৃতিমনার পরিচয় পাওয়া যায়।

মজলিস নবরাজ ছিলেন রোসাঙ্গ রাজ্যের মহামাত্য। "অন্নে বস্ত্রে তুষিয়া পোষন্ত নিরন্তর"।[৫] তিনি দেশের নামী দামী মুসলমানদের আমন্ত্রণ করে যে ভোজ সভার আয়োজন করেন তা রাজকীয় ভোগ বিলাসের চিত্র বলতে দ্বিধা নেই—

চন্দন কস্তুরী আদি গোলাপ সুগন্ধ।
কর্পূর তাম্বুলে সভা হইল আনন্দ।।
বাদ্য কবিলাস আদি যন্ত্র সুললিত।
কেহ কেহ সুস্বরে গাহে গীত।।[৬]

Dhaka University Institutional Repository

ভোজ সভাকে আনন্দ মুখর করার জন্য সঙ্গীত চর্চাকে অভিজাত সমাজের চিত্র হিসেবে মনে করা হয়। এমন রাজকীয় ভোজপর্ব দেয়া ও বিলাসিতা কেবল অভিজাত ধনী ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব।

শ্রী চন্দ্র সুধর্ম রাজার রাজপ্রাসাদ ও রাজধানী রোসাঙ্গ, তাঁর পাত্র মিত্র, অশ্ব বাহিনীর যে পরিচয় দেয়া আছে—তাকে একজন উচ্চ পদস্থ সামন্ত বলে মনে হয়। কিন্তু তিনি যে অত্যাচারী সামন্ত ছিলেন তা নয়। তিনি জ্ঞানবান, ন্যায়বান ও দানশীল মহাপুরুষ ছিলেন। যদিও তিনি বাস করতেন "হেমরত্ন বিরাজিত প্রাসাদে, সুচারু রোসাঙ্গ ছিল তাঁর রাজধানী। তাঁর পাত্র মিত্র ছিল মণিমুক্তা কাঞ্চন ভূষিত, তাঁর হস্তীযূথ মেঘ ঘটা' তুল্য, অশ্ববাহিনী গিরিবনে ধায় অলক্ষিত"।[৭] এ বর্ণনা নিঃসন্দেহে সামন্ত সমাজের বর্ণনা।

সমাজের শীর্ষে আছেন রাজা। তাঁকে কেন্দ্র করে বিরাজ করছে অভিজাত অমাত্য প্রসাদপুষ্ট সামাজিক মানুষ। অমাত্য সভায় যে শ্রোতৃমণ্ডলের কাছে কবি এই অনূদিত কাব্যটি পরিবেশন করেছিলেন তারা সকলেই ছিলেন সামন্ত সমাজ সংস্কৃতির ধারক। ভূমি ভিত্তিক সামন্ত প্রভুরা ছিলেন সমাজের সুবিধাভোগী। এঁরা যুদ্ধবিদ্যায় যেমন ছিলেন পারদর্শী তেমনি কাব্যচর্চায় ছিলেন উৎসাহী। প্রচুর ভোগ এবং অবসর পুষ্ট এই অমাত্য ও সামন্ত শ্রেণী প্রেম ও যুদ্ধের রোমাঞ্চ রস মুখর কাব্যকাহিনী পছন্দ করতেন। এঁদের কাছে দার্শনিক চিন্তা ভাবনার চেয়ে প্রেম ও যুদ্ধ কাহিনী বেশি আকাঙ্ক্ষিত ছিল। জায়সী তত্ত্বাশ্রয়ী করে যে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ জীবনকে *পদমাবৎ* কাব্যে উপস্থাপন করেছেন আলাওল সেই তত্ত্ব কথাকে যত দূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত ও স্থানে স্থানে গ্রহণ বর্জন করে সমাজে উপস্থাপন করেছেন। সামন্ত প্রভুরা রোমাঞ্চ রস মুখর কাব্য বেশি পছন্দ করতেন বটে কিন্তু তাই বলে সেখানে অন্য কোন সাহিত্য, সঙ্গীত চর্চা হত না তেমনটি নয়। আলোচ্য *পদ্মাবতী* কাব্যে আমরা পুরাণ, বেদ, সঙ্গীতচর্চার উল্লেখ বহু স্থানে পেয়েছি।

Dhaka University Institutional Repository

আলাওলের সময়ে আরাকান রাজ্যে বাণিজ্য উপলক্ষে বহুদেশ হতে বহু জাতির লোকের সমাগম হত। রাজসভায় সমাগত যে জনমণ্ডলীর পরিচয় আলাওল দিয়েছেন তাতে আরবী, মিশরী, তুর্কী, হাবশী, রুমী, বর্মী, শ্যামদেশী, খোরসানী, উজবেগী, লাহোরী, সুলতানী, সিন্ধী, কাশ্মীরি, দক্ষিণী, কামরূপী, ওলন্দাজ, ইংরেজ, ফরাসী, পর্তুগীজ প্রভৃতি বহু জাতির পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। আলাওলের বাসভূমি রোসাঙ্গ নগরী বহুজাতির নগর বা কসমোপোলিটন সিটিতে পরিণত হয়েছিল বলতে দ্বিধা নেই। এ বর্ণনা আলাওলের নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে রচিত, মালিক মুহাম্মদ জায়সীর অনুকরণ, অনুসরণ বা অনুবাদ নয়।

অবস্থানানুসারে এদেশ ছিল নানা প্রাকৃতিক সম্পদে পূর্ণ। জাতিগতভাবে বাঙালিরা ছিল আরণ্যক সভ্যতার উত্তরাধিকারী। এর কারণ প্রাচীন কাল থেকে উনিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত বাঙালি জাতি ছিল কৃষি সভ্যতায় সভ্য। মানুষ সাধারণত কৃষিকাজ করে জীবন অতিবাহিত করত। ভূমি ভিত্তিক সামন্ত প্রভুরা ছিলেন সুবিধাভোগী। সুবিধা ভোগী হলেও তারা অত্যাচারী শাসক ছিলেন না। দানে ধ্যানে সামন্তরা ছিলেন অকৃপণ। সকলকে নিয়ে তারা প্রেম প্রীতির মধ্যে বসবাস করতেন।

আরাকান ছিল নদীমাতৃক দেশ। পর্বত এবং ঘন বনে আকীর্ণ ছিল আরাকান রাজ্যটি। আর এ জন্যই ছিল বসবাসের অনুপযোগী। এ জন্য এ অঞ্চলের লোকজন পরিবার পরিজন নিয়ে নৌকায় বসতি স্থাপন করতেন। নৌকাগুলো ছিল বাঁশ ও কাঠের তৈরি। নৌকার ছইগুলো ছিল ঘরের চালের মত বাঁকানো। সাধারণ লোকজনের বসবাসের জন্য এটাই ছিল উত্তম ব্যবস্থা।

রাজ পরিবারের সদস্য এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা নৌকা বিহারকে গৌরব মনে করতেন। নৌকা বিহার এখনও আমাদের সমাজে সমাদৃত। নৌকাতে রাজার বসবাসের উপযোগী প্রাসাদও নির্মাণ করা হত। নৌকার মধ্যে রাজ পরিবারের বসবাসের জন্য উপযুক্ত বড় বড় ঘর নির্মিত হত। নৌকাগুলি যখন নদীতে ভাসত তখন ভাসমান নগর বলে ভ্রম হত। তৎকালীন বিদেশী পর্যটক এ সমস্ত নৌকাকে আরাকানের ভাসমান নগর বলে বর্ণনা করেছেন–

Dhaka University Institutional Repository

জথ লোক দন্ড ধারী বৈরিবধূ রম্ভকারি
কর তুলি করে নিসূদন।
নৃপতির শত্রু চয় একেশ্বর করে ক্ষয়
তুমি সব আইস কি কারণ।[৮]

আলাওল রোসাঙ্গ বর্ণনা অধ্যায়ে নৌকার যে বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে আরাকানে নৌ-সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। বিদেশী পর্যটকও এই ভাসমান নগর দেখে অভিভূত হতেন। ঐ সময়ে জলপথের বাহন হিসেবে নৌকার বেশ কদর ছিল। আলাওলের রোসাঙ্গ রাজধানীর বর্ণনায় যে পরিচয় আমরা পাই সেখানে বাণিজ্য উপলক্ষে, অর্থলোভে, সম্মানের আশায় ভারতবর্ষ এবং ইউরোপের বহুদেশ হতে বিভিন্ন মানুষের উপস্থিতি দেখে কবি লিখেছেন —

নানা দেশী নানা লোক শুনিয়া রোসাঙ্গ ভোগ
আইসেন্ত নৃপ ছায়াতল।
আরবী মিশরী শামী তুরকী হাবশী রুমী
খোরাসানী উজ্বেগী সকল।।
লাহুরী মুলতানী হিন্দী কাশ্মীরী দক্ষিণী সিন্ধী।
কামরূপী আর বঙ্গদেশী।
ভূপালী কুদংসরী কান্নাই মলআবারী
আচি কোচি কর্ণাটকবাসী।।
বহু শেখ সৈয়দ জাদা মোগল পাঠান যোদ্ধা
রাজপুত হিন্দু নানা জাতি।
আভাঙ্গ বরমা শাম ত্রিপুরা কুকির নাম
কতেক কহিমু জাতি ভাঁতি।।
আরমানী ওলন্দাজ দিনেমার ইঙ্গরাজ
কান্টিলান আর ফরাসিস।
হিসপানী আলমানী চোলদার নসরাণী
নানা জাতি আর পর্তুগীস।।[৯]

Dhaka University Institutional Repository

আলাওলের এ বর্ণনা দেখে মনে হয় রোসাঙ্গ নগর সেই সময় কসমোপলিটন নগরে পরিণত হয়েছিল। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এমন আন্তর্জাতিক পরিবেশের বর্ণনা আর নেই, এটাকে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একমাত্র নাগরিক বর্ণনাও বলা চলে।

সিংহলের রাজা গন্ধর্ব সেন আর এক সামন্ত প্রভুর উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি চতুরঙ্গের অধিকারী। তাঁর অশ্ব ও হস্তীর সংখ্যা যথাক্রমে সতের হাজার ও সাত হাজার। তুরঙ্গগুলি বায়ুগতি সম্পন্ন। রাজা নিজ বাহুবলে ক্ষিতি পালন করেন। শক্তিমান রাজার কাছে 'নৃপ সবে সমুখে করএ নম্র শির'। 'তিনি সুরক্ষিত দুর্গে বাস করেন। ইন্দ্রসভার মত—'নৃপতির সভা অতি সুচারু লক্ষণ।' 'রত্ন সিংহাসনে' রাজা উপবিষ্ট, 'কুটুম্ব বন্ধুগণ' তাঁকে বেষ্টন করে আছেন"।[১০]

কেহ কেহ হস্তক সহিতে পড়ে বেদ।
কেহ সুপ্রসঙ্গে কহে পুরাণের ভেদ।।
নানা রাগে নানা ছন্দে কেহ গায় গীত।
কেহ কেহ নানা যন্ত্রে বাএ সুললিত।।
চন্দন কুম কুম চুয়া কস্তুরী কাফুর।
আমোদ সৌরভ সব দেশ ভরিপুর।।[১১]

নিঃসন্দেহে বলা যায় রাজা গন্ধর্ব সেন যেমন ছিলেন ধর্মভীরু তেমন ছিলেন সঙ্গীতপ্রেমী। এ জন্যই তাঁর রাজসভায় পুরাণ বেদ নিয়ে ধর্মশাস্ত্র চর্চার পাশাপাশি নানা বাদ্যে, ছন্দে ও রাগে হচ্ছে সঙ্গীত চর্চা। এ থেকে গন্ধর্ব সেন যে একজন রুচিশীল ও সংস্কৃতিবান ব্যক্তি ছিলেন তা প্রত্যক্ষ করা যায়।

চিতোরের রাজা রত্নসেন ছিলেন সামন্ত চেতনার মূর্ত প্রতীক। তিনি "অস্ত্রে শাস্ত্রে রূপে গুণে সাহসে অধিক"।[১২] তিনি এক লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে শুক পাখি ক্রয় করেন, শিকারে যান। শুকের মুখে পদ্মাবতীর রূপের কথা শুনে প্রেমাসক্ত হন এবং তাকে পাবার জন্য যোগীর ছদ্মবেশে যাত্রা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

রত্নসেন সিংহলবাসীর কাছে নিজের যে পরিচয় দেন তাতে একজন দক্ষ সামন্তপতির মূর্তি প্রকাশিত হয়। তিনি অস্ত্র, শস্ত্র, শাস্ত্র ও ক্রীড়া সর্ব বিষয়ে পারদর্শী। শুক পাখি পদ্মাবতীর কাছে রত্নসেনের যে পরিচয় তুলে ধরে—

রূপে যিনি পঞ্চবাণ বিদুর সদৃশ্য জ্ঞান
ধর্মেত জিনিয়া যুধিষ্ঠির।
দানে মানে কর্ণ কুরু বুদ্ধি জিনি সুর গুরু
জম্বুদ্বীপ মধ্যে এক বীর।।
অল্প বসে রাজ্যপাল বিপক্ষ জনের কাল
ক্ষমা এ পৃথিম্বী সমসর।
সাহসে বিক্রমাদিত সত্যে হরিশ্চন্দ্র জিত
মর্যাদায় সিন্ধু রত্নাকর।।[১৩]

রত্নসেনের মহানুভবতা এবং সত্যবাদিতার ইঙ্গিত আলোচ্য অংশে বিধৃত। তিনি যেমন ছিলেন ধার্মিক তেমনি ছিলেন যুধিষ্ঠিরের মত সত্যবাদী। তিনি দানে মানে কর্ণের সমান। সাহসে বিক্রমাদিত্য এবং সত্য পালনে হরিশ্চন্দ্র তুল্য। এখানে পৌরাণিক প্রসঙ্গ এনে রত্নসেনের পরিচয় দেয়া হয়েছে।

সামন্ত জীবন চেতনায় ব্যক্তি ও শিল্পী আলাওল এক ও অভিন্ন। রাজকন্যা পদ্মাবতীর যোগ্য পাত্র প্রমাণ করার জন্যই এ পরীক্ষা। অন্যদিকে পদ্মাবতী রূপসৌন্দর্য, পোশাক পরিচ্ছদ, সুরম্য প্রাসাদ, দাস-দাসী, বিলাস শিক্ষা, অভিপ্রায় ও রুচি নিয়ে সামন্ত তনয়ার এক মূর্ত প্রতীক। পদ্মাবতী ও রত্নসেনের প্রেমের উন্মেষ, বিকাশ, প্রণয় সঞ্চার, মিলন ও বাসর প্রভৃতি বর্ণনার মধ্যে যে জীবনবোধ ও রুচির পরিচয় আছে তা অভিজাত জীবনের পক্ষেই সম্ভব।

আলাওলের সমকালীন সমাজ হচ্ছে অভিজাত সমাজ। সামন্তপতি এবং বাণিজ্য উপলক্ষে আগত সবাই অভিজাত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। *পদ্মাবতী* কাব্যে আমরা দুর্গ ভিত্তিক সামন্ত তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার পরিচয় বেশি

Dhaka University Institutional Repository

পাই। সিংহল, চিতোর ও দিল্লির নগরকে কেন্দ্র করে রাজপ্রাসাদ, দরবার, দুর্গপ্রাকার, পরিখা, তোরণ, বুরুজ উদ্যান, হাট বাজার এর যে বর্ণনা আছে তার সবটাই মূলানুসারী এবং এ জন্যই এ সমাজ অভিজাত সমাজ।

পদ্মাবতী কাব্যে অভিজাত সমাজকেই বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। তবে এর পশ্চাতে আমরা সাধারণ বৃত্তিজীবী মানুষেরও পরিচয় পাই সিংহল হাটের বর্ণনায়। *পদ্মাবতী* কাব্যে অভিজাত সম্প্রদায়ের বর্ণনা যত নিখুঁত ভাবে করা হয়েছে সাধারণ বৃত্তিজীবীর বর্ণনা সেভাবে করা হয়নি বটে তবে এদের ভূমিকা সমাজে কম নয়। এরা সংখ্যায় কম কিন্তু সমাজে এদের অবদান বেশি।

দুইভিতে রত্নপূর্ণ রজতের হাট।
মধ্যভাগে কদর্য বর্জিত শুদ্ধ বাট।।
উচ্চ পিড়ি কাঞ্চন রজত করি ঢাল।
নানাবিধ চিত্র তাহে করিয়াছে ভাল।।
হাটশালে মৃগমদ কুঙকুম লেপনে।
লক্ষ কোটি পসার মেলিছে জনে জনে।।
হিরামণি মাণিক্য মুকুতা গজমতি।
পুস্পরাগ গোমেদ বিদ্রুম নানাজাতি।।
কুঙ্কম আগর মেদ মৃগমদ বেনা।
যাবক কর্পূর ভীমসেনী আর চীনা।।
ফুলেল গুলাল চূয়া চন্দন আগর।
জরতারি পাটাম্বর সুচারু চামর।।
এহি হাটে বিকিকিনি করে সেই জন।
আর হাটে তার ফল নাহি কদাচন।।
কেহ রঙ্গ চাহে কেহ করে বিকিকিনি।
কার হয় লভ্যপ্রাপ্তি কার হয় হানি।।[১৪]

Dhaka University Institutional Repository

হাটের বর্ণনায় দেখি বিভিন্ন স্থান হতে বিভিন্ন বৃত্তিজীবী মানুষের আগমন ঘটেছে। হাটে তারা বিভিন্ন পসার মেলে বসেছে। একদিকে উচ্চবিত্ত অবস্থা সম্পন্ন মানুষ যারা মূল্যবান অলঙ্কারাদি (মণিমুক্তা খচিত হার, গজমতি হার, হাতের বালা, পাথরে খচিত পোশাক প্রভৃতি) বিক্রি করছে অন্যদিকে সাধারণ বৃত্তিজীবী মানুষ যারা স্বল্প মূল্যের কিন্তু নিত্য প্রয়োজনীয় প্রসাধনী যেমন– আলতা, সিন্দূর, কর্পূর, সুগন্ধি তেল, আবীর, রেশম বস্ত্র প্রভৃতি বিক্রি করছে। এই হাটে বণিক বা পেশাদার ব্যবসায়ী শ্রেণীর পরিচয় পাই। এসব দ্রব্যাদি বেচাকেনা করে কেউ হচ্ছে লাভবান এবং কেউ হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত। কবি সিংহল হাটের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে আবহমান বাঙালি সমাজের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। একদিকে আছে অবস্থা সম্পন্ন অভিজাত সমাজ এবং তাঁদের সাহায্য বা সেবা দানের জন্য নিয়োজিত সাধারণ মানুষ। এ কাব্যে বর্ণিত যে সমাজ তা প্রীতি ও প্রেমের বাধনে আবদ্ধ সাধারণ বাঙালির সমাজ।

পদ্মাবতী কাব্যে সাধারণ বৃত্তিজীবী যে সব মানুষের পরিচয় পাওয়া যায় তাদের মধ্যে অন্যতম–নাপিত, নর্তকী, ফুল বিক্রেতা, চিত্রকর, সিন্দূর, কর্পূর ও আবীর বিক্রেতা। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সমাজে সকল স্তরের মানুষের কাছে নাপিত সমাদৃত ছিল। উচ্চবিত্তের ঘরে নাপিতের কদর ছিল আরও বেশি। বিয়ের অনুষ্ঠানে নাপিত ডেকে বর কন্যাকে ক্রিয়া শুদ্ধি করানো হত—

নাপিত ডাকিয়া আনি তৃতীয় প্রহরে।
করিলা খেউর কর্ম কন্যা কুমাররে।।[১৫]

এই সম্প্রদায় খেউর কর্ম করে জীবিকা নির্বাহ করত।

নাচ, গান, বাজনা সব সময় সমাজে জনপ্রিয়। নর্তকী নাচে গানে সভা আমোদিত করত। নর্তকী–বেশ্যা এ জাতীয় রমণীরা নৃত্য শিল্পী হিসেবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নাচ গান পরিবেশন করত—

(১) দক্ষিণী নর্তকী যেন ত্রিপদ দেখায়।
আগে পাছে চতুর্দিকে চিনন না যায়।।[১৬]

Dhaka University Institutional Repository

(২) নৃত্যগীত আনন্দ বাজায় পূণ্য দেশ
নাচে বেশ্যা নৃত্য কালে মনোহর বেশ।।[১৭]

রতনে জড়িত সপ্তখণ্ড ধরাহর।
নানা বর্ণ চিত্র করিয়াছে চিত্রকর।।[১৮]

এ বর্ণনা হতে সমাজে চিত্রশিল্পীর কদর বুঝা যায়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এবং বসতবাড়ি সাজাতে চিত্রকর্ম ব্যবহার করা হয়। ঘরের দেয়ালে নানা বর্ণের নানা রঙের চিত্র অংকন করে দেয়ালের শোভা বর্ধন করার প্রচলন ছিল।

নারী বিক্রেতার উল্লেখ আমরা সিংহল হাটের বর্ণনাতে পাই—

"সুন্দরী পদ্মিনী সবে দেয়ন্ত পসার"।।[১৯]

এছাড়া সমাজে আর এক শ্রেণীর লোকের পরিচয় পাওয়া যায় যারা জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ছিল। এদের পরিচয় মধ্যযুগে রচিত প্রায় প্রতিটি রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানমূলক কাব্যে পাওয়া যায়। সমাজে এদের বেশ কদর ছিল। উৎসব, পার্বণ, বিবাহ, সন্তানের ভাগ্য গণনা, যাত্রার শুভাশুভ নির্ণয়ে লোকজন এদের শরণাপন্ন হত এবং উপযুক্ত সম্মানি দিত।

অদৃষ্টবাদে বিশ্বাসবশত কুসংস্কারাচ্ছন্ন এ সমাজ দৈবজ্ঞের বাণীকে শিরোধার্য মনে করত। যে কোন কাজ দৈবজ্ঞের আদেশ অনুযায়ী করা রীতি সম্মত ছিল।

বিত্ত অপেক্ষা চিত্তকে সে যুগে বেশি প্রাধান্য দেয়া হত। হিন্দুস্থানী প্রথা সমাজে প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও অমুসলিম রাজারা জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে প্রজাদের কল্যাণের জন্য শ্রমজীবী মানুষের প্রতি সমবেদনশীল ছিলেন। তাঁরা নিজেদের এবং সাধারণ মানুষের রস আস্বাদনের জন্য কবিতা রচয়িতাদের সম্মানি দিয়ে পালন করতেন। সমাজে বসবাসরত বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের অবস্থান দেখে মনে হত তাদের মধ্যে হিংসা, দ্বেষ ছিল না। সবাইকে সুখী মনে হত। সবাই সুখে শান্তিতে মিলেমিশে বসবাস করত—

Dhaka University Institutional Repository

কিবা রায় কিবা রঙ্ক ঘরে ঘরে সুখী।
বালবৃদ্ধ যুবক সকল হাস্যমুখী।।[২০]

সমাজ সংস্কৃতি বর্ণনায় আলাওল আলোচ্য *পদ্মাবতী* কাব্যে যে সব নিয়ম নীতি ও আচার আচরণের উল্লেখ করেছেন তাতে আবহমান বাঙালি সমাজের একটি নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায়। 'পদ্মাবতী ও রত্নসেনের' জন্মগ্রহণ থেকে শুরু করে তাঁদের বিবাহ, বাসর, নাগমতি ও পদ্মাবতীকে নিয়ে সুখের সংসার যাপন, রত্নসেনের মৃত্যুর পর দুই রাণীর সহমরণ বরণ প্রত্যেকটি ঘটনা তিনি এত নিখুঁত ও জীবন্ত করে পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন যা পাঠকের হৃদয়কে স্পর্শ করে। আর উপকরণ হিসেবে তিনি বাঙালি সমাজকে বেছে নিয়েছেন।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর নব জাতকের ভাগ্য গণনা বাঙালি সমাজের একটি চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। তাই জ্যোতিষ শাস্ত্র চর্চার পরিচয় পদ্মাবতী কাব্যে প্রত্যক্ষ করি। যথারীতিতে পদ্মাবতীর জন্ম গ্রহণের পরই হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্রানুযায়ী জ্যোতিষী এসে পদ্মাবতীর ভাগ্য গণনা করেন। গণক পুরাণ শাস্ত্রাদি পড়ে, রাশি নক্ষত্র বিচার করে নব জাতক সম্পর্কে ভবিষ্যৎদ্বাণী করে, কোষ্ঠি গণনা ও জন্ম পত্রিকা প্রস্তুত করেন। মূলে ৬ষ্ঠ দিনে অর্থাৎ ষষ্ঠীর রাতে উৎসব পালনের উল্লেখ আছে কিন্তু অনুবাদে আছে সপ্তম দিনের কথা। ভবিষ্যদ্বাণীতে মূলে জম্বুদ্বীপে পদ্মাবতীর মৃত্যুবরণ উল্লেখ আছে কিন্তু আলাওল লিখেছেন জম্বুদ্বীপ হতে পদ্মাবতীর বর আগমনের কথা। ষষ্ঠী অনুষ্ঠান অত্যন্ত আনন্দ মুখর ছিল—

উৎসব আনন্দ সপ্তদিন নির্বাহিল।
প্রভাতে পণ্ডিত বিপ্রগণ যে আইল।।
শুভক্ষণে শুভলগ্নে হইছে উৎপত্তি।
কন্যারাশি কন্যানাম থুইল পদ্মাবতী।।
ভাগ্যের মাণিক্য জ্যোতি উজ্জ্বল ললাট।
কীর্তি শুনি নৃপগণ তেজিলেক পাট।।
অবতীর্ণ হৈল কন্যা সিংহল নগর।

Dhaka University Institutional Repository

জম্বুদ্বীপ হোন্তে আসিবেন্ত যোগ্যবর।।
জন্মপত্র লিখিয়া করিয়া আশীর্বাদ।
ঘরে গেল বিপ্রগণ পাইয়া প্রসাদ।।[২১]

রজনী ভোর হলো পণ্ডিতেরা এসে পাঁজি পুরাণ বিচার করে জন্ম তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলেন। শুভ সময়ে ভূতলে চন্দ্র উদিত হয়ে কন্যার জন্ম হয়েছে সুতরাং নাম রাখা হলো পদ্মাবতী। সিংহল দ্বীপে এঁর জন্ম এবং জম্বুদ্বীপ হতে আসবে কন্যার বর। জন্মের পর তিথি, লগ্ন দেখার এ প্রচলন শুধু পদ্মাবতী ও রত্নসেনের জন্য প্রযোজ্য নয় বরং এটি বাঙালি সমাজের একটি রীতি ছিল।

'রত্নসেনের জন্মখণ্ড' রত্নসেনের জন্ম ও ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ হয়েছে। পদ্মাবতীর জন্মলগ্নে জ্যোতিষেরা যেভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন রত্নসেনের জন্মলগ্নেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। রত্নসেনের জন্মের পর জ্যোতিষ ভাগ্য গণনা করে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। রত্নসেন চিত্রসেনের রাজ্য উজ্জ্বল করে জন্মালেন। চারদিক হতে জয়ধ্বনি ধ্বনিত হলো। মঙ্গল ধ্বনি বাজতে লাগল—

সুকুমার রত্নসেন জন্মিল যখন।
রাশিবর্গ বিচারি কহিলো বিপ্রগণ।।
রত্নতুল্য প্রাপ্তি হৈব অমূল্য মাণিক।
চন্দ্রসূর্য মিলনে আনন্দ হৈবধিক।।
মালতী ভ্রমরা প্রায় হইয়া বিয়োগী।
রাজ্যপাট ত্যেজিয়া হইয়া যাইব যোগী।।
সিংহল দ্বীপেতে যাই সিদ্ধি করি কাজ।
পুনি চিতাউরে আসি ভুঞ্জিবেক রাজ
দিল্লীশ্বর সঙ্গে যুদ্ধ হইব বহুতর।
এত কহি বিপ্রগণ চলি গেল ঘর।।[২২]

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্যাভাস চর্চা সমাজের একটি চিরাচরিত প্রথা। একবিংশ শতাব্দির মত মধ্যযুগেও বিদ্যা অর্জন ও শাস্ত্র চর্চার প্রচলন ছিল। সাধারণত সন্তানের বয়স চার পাঁচ বছর পূর্ণ হলে তাদের শাস্ত্র শিক্ষা দেয়া হত। যেহেতু স্কুল কলেজ সে সময় তেমন বিস্তার লাভ করেনি তাই শিক্ষা লাভ আজকের মত সহজ সাধ্য ছিল না। শিক্ষা চর্চার প্রচলন সাধারণত রাজা বাদশা বা অভিজাত সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু নিম্নবিত্ত পরিবারে লেখাপড়ার প্রচলন একেবারেই ছিল না একথা বলা যুক্তিসঙ্গত নয় কারণ প্রাথমিক জ্ঞান অর্জনের জন্য যতটুকু লেখাপড়া শেখার প্রয়োজন তা সাধারণ পরিবারেও প্রচলিত ছিল। মধ্যযুগে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আমরা এ সত্যতার প্রমাণ পাই। লহনা ও খুল্লরা সাধারণ পরিবারের মেয়ে হয়েও চিঠি লিখতে পারত। এ থেকে ধারণা করা যায়—সাধারণ পরিবারে লেখাপড়ার কিছুটা হলেও প্রচলন ছিল।

পদ্মাবতী কাব্যে আমরা দেখি পদ্মাবতী ও রত্নসেনের বয়স চার-পাঁচ বছর হলেই তাদেরকে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে হয়েছে। পদ্মাবতীকে সর্ব শাস্ত্রজ্ঞা করে তোলার মধ্যে আদর্শায়ন ঘটলেও সে কালে অভিজাত নারী সমাজে শাস্ত্র শিক্ষা যে উপেক্ষণীয় ছিল না তা অস্বীকার করা যায় না—

পঞ্চম বরিষ যদি হৈলা রাজ বালা।
পড়িতে গুরুর স্থানে দিল ছাত্রশালা।[২৩]

হাতেখড়ি দেয়া তৎকালীন সমাজে সর্বজন স্বীকৃত অনুষ্ঠান ছিল। এ অনুষ্ঠান অভিজাত বা রাজা বাদশাহর পরিবারেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়। এ অনুষ্ঠান ছিল সর্বকালের বাঙালি সমাজের একটি আনন্দঘন অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে পণ্ডিত ডেকে সন্তানদের হাতেখড়ি দেয়া হত। অনুষ্ঠান সমাপণে আগত দর্শক ও অতিথিকে ফলাহার ও মিষ্টি মুখ করানোর প্রথা ছিল। পদ্মাবতী ও রত্নসেনের হাতেখড়ি অনুষ্ঠানেও এ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেনি। সাধারণত মাঘ মাসের শ্রী পঞ্চমী তিথিতে অনুষ্ঠানের প্রচলন বেশি দেখা যায়। ফলাহার শেষে আমন্ত্রিত অতিথি পুত্র-কন্যাকে আর্শীবাদ করতেন তারা যেন সর্ব শাস্ত্রে শাস্ত্রজ্ঞ হয়ে দেশ ও দশের সম্মান রক্ষা করতে

Dhaka University Institutional Repository

পারে। যথা নিয়মে পদ্মাবতীর যখন পাঁচ বছর পূর্ণ হলো তখন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ডেকে তাঁকে হাতে খড়ি দেয়া হলো। তাঁকে পুরাণ দিয়ে পড়তে বসানো হলো। পদ্মাবতী গুণী ও পণ্ডিত হলেন; চারদিকে পদ্মাবতীর রূপ ও গুণের কথা ছড়িয়ে পড়ল। একে রূপে পদ্মিনী, তদুপরি পড়াশোনায় পণ্ডিত। পদ্মাবতী দিনে দিনে জ্ঞানে গুণে রূপে পিতা গন্ধর্ব সেনের সুযোগ্যা কন্যা হলেন। কন্যার গর্বে গন্ধর্ব সেন গর্বিত। এ গর্ব শুধু গন্ধর্ব সেনের নয় এ গর্ব সর্বকালের সর্ব সমাজের সকল পিতার।

এরপর কন্যা আস্তে আস্তে বয়ঃসন্ধিতে পরিণত হলো। যথারীতি পদ্মাবতীর বার বছর পূর্ণ হলো—

সম্পূর্ণ হৈল যদি দ্বাদশ বৎসর।
হৈল সংযোগ যোগ্য ভাবে নৃপবর।।
সপ্ত খণ্ড সাজাইয়া সুবর্ণ আবাস।
সখিগণ সঙ্গে দিলা তথাত নিবাস।।
নবীন বয়সী সব রসের সহিনি।
কমল নিকেটে যেন শোভে কুমুদিনী।।[২৪]

পদ্মাবতীর বয়স বার বছর পূর্ণ হলো; রাজা শুনলেন তিনি মিলন যোগ্যা হয়েছেন। রাজা সাত মহল প্রাসাদ নির্মাণ করে পদ্মাবতীকে বসবাস করার জন্য দিলেন। পদ্মাবতীকে সঙ্গ দেবার জন্য সখিরাও সেখানে বসবাস করতে থাকে। সম্ভবত তৎকালীন সমাজে এ নিয়ম প্রচলিত ছিল।

শাস্ত্র খণ্ড ও চৌগান খণ্ড দুটিতে রত্নসেনের পাণ্ডিত্য প্রকাশ উপলক্ষে সেকালের শাস্ত্র চর্চার বেশ কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। রত্নসেনের পাণ্ডিত্য কিছুটা আদর্শায়িত হলেও সেকালে সমাজে প্রচলিত বিদ্যাচর্চা রূপে শাস্ত্র তালিকাটি উল্লেখযোগ্য। সূত্রবৃত্তি, পঞ্জিকা, ব্যাকরণ, অভিধান, সাহিত্য, পুরাণ, বেদ, তর্কশাস্ত্র, অলঙ্কার, ছন্দশাস্ত্র, সঙ্গীতশাস্ত্র সে যুগের অভিজাত সমাজে চর্চা হত—

Dhaka University Institutional Repository

সূত্র বৃত্তি পঞ্জিকা ব্যাকরণ অভিধান।
একে একে রত্নসেন করিলা বাখান।।
সাহিত্য পুরাণ বেদ তর্ক অলঙ্কার।
নানাবিধ বাক্যরস আগম বিচার।।
নিজ কাব্য যতেক পড়িল নানা ছন্দ।
শুনিয়া পণ্ডিতগণ হৈল অতি ধন্দ।।
সবে বোলে তান কণ্ঠে ভারতী নিবাস।
কিবা বররুচি ভবভূতি কালিদাস।।[২৫]

চৌগান বা পোলো খেলা মধ্যযুগে মধ্য এশিয়া থেকে আগত ঘোড় সওয়ার নৈপুণ্য সুলতানদের বেশ উত্তেজনাকর ক্রীড়া কৌতুক হিসেবে জনপ্রিয় ছিল বলেই আলাওল রত্নসেনের পরীক্ষার বিবরণ দিতে গিয়ে মূল বর্হিভূত একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা করেছেন—

চৌগান খেলিতে হৈল অশ্বে আরোহণ।
দুই দিকে চারি খুঁটি আনিয়া গাড়িল।
মধ্যভাগে আরোপিয়া গেড়ুয়া ফেলিল।।
মিশামিশি হইয়া তবে লাগিল খেলিতে।
সকলে চাহন্ত নিতে আপনার ভিতে।।
সিংহলের অশ্ববারে গুলি নিতে চায়।
চৌগান ঠেলিয়া যোগী গুলি পল্টায়।।
গেড়ুয়া বেড়িয়া শব্দ শুনি ঠনাঠনি।
দূরে থাকি দেখে রত্নসেন নৃপমণি।।
ঈষৎ হাসিয়া নৃপ আসিয়া ত্বরিত।
গেড়ুয়া মারিয়া দিল সিংহলের ভিত।।[২৬]

চৌগান খেলাটি অবসর সময়ে বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। রাজপরিবারে খেলাটি সমাদৃত ছিল বলেই কবি অতিরিক্ত এই খণ্ডটি সংযোজন করেছেন। অশ্বপৃষ্ঠে চড়ে বল দিয়ে এক ধরনের খেলাকে চৌগান

Dhaka University Institutional Repository

বা পোলো খেলা বলা হয়। সম্ভবত চৌগান খেলা পৃথিবীর প্রাচীনতম খেলা। আলাওলের কাব্যে পোলো খেলার উল্লেখ থেকে মনে হয় আরাকান দেশে সপ্তদশ শতকে পোলো খেলা বেশ সমাদৃত ছিল।

অশ্বচালন বিদ্যা সামন্ত সমাজে শাস্ত্র শিক্ষার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে প্রবর্তিত ছিল। বিশেষ করে রাজপরিবারে অশ্বচালন বিদ্যা আয়ত্ত করা অনেকটা বাধ্যতামূলক। আলাওল নিজেও অশ্বারোহী সৈনিক হিসেবে অশ্বচালন বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তখনকার দিনে যুদ্ধ বিগ্রহ অশ্বপৃষ্ঠে চড়েই করতে হত। সম্ভবত এ জন্যই আলাওল রত্নসেনকে একজন সফল অশ্বারোহী হিসেবে পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন—

নৃপতির আরতি বুঝিয়া রত্নসেনে।
চড়িয়া ফিরায় অশ্ব বিবিধ বিধানে।।
প্রথমে দোগাম চালি সাহা গোমগাম।
এড়িয়া এড়িয়া রফা রহি অনুপাম।।
বোহা আর সপ্তচালি চালাইল সকল।
না নড়ে অঙ্গের মাক্ষি উদরের জল।।
.....
দক্ষিণে ফিরায় ক্ষেণে ক্ষেণে বাম পাক।
অলক্ষিতে গতি যেন কুম্ভকারের চাক।।[২৭]

এখানে অশ্ব চালনায় রত্নসেনের দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি দোগাম, সাহা, গোমগাম, রফা, বোহা প্রভৃতি চালে অশ্ব চালিয়ে নিজের দক্ষতার পরিচয় দিয়ে সিংহল বাসিকে মুগ্ধ করেছেন। *পদ্মাবতী* কাব্যের ঐ চৌগান খেলার বিবরণীটি শুধু মৌলিক নয় আলাওলের বর্ণনা শক্তিরও উদাহরণ।

বিভিন্ন রাগতালে গান রচনা করে আলাওল সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। তিনি ছিলেন সংগীত প্রেমী এবং সুগায়ক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল। তিনি ধনীর ঘরে সঙ্গীতের শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। পদ্মাবতী কাব্যের গান ছাড়া বৈষ্ণবগানে তাঁর দক্ষতা ছিল। রাগ নামায় 'রাগের

Dhaka University Institutional Repository

দিগাসন' এবং তালনামায় তালের 'জন্মকথা' বিবাহ ও দাম্পত্য সম্পর্কে তিনি যে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা সাধারণ জ্ঞানের অগোচর। পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তির লক্ষ্যে আলাওল রচিত 'তালের দাম্পত্য' অংশটি উদ্ধৃত হলো—

শুন শুন গুণিগণ কহম শুন আর
কোন তালি কোন কাম করএ রাগার
অষ্ট তালা হএ জান এক তালার সঙ্গে।
প্রথমে দেবরানা কথা কহিবাম রঙ্গে।।
বৃত্তি বিলাসিনী জান এই দুই কামিনী।
তালারে ভুঞ্জাএ নিত্য মনে সুখ গুণি।।
.....
জয়দ দমাই জান এই দুই কামিনী তারি।।
ধন্য দ্রব্য যথ আদি রাখএ সম্বরি।।[২৮]

পদ্মাবতী কাব্যে বিভিন্ন রাগ ও তালের উল্লেখ আছে। যেমন– লাচারি, কেদার, চন্দ্রাবতী, ধানসী, মালসী, গান্ধার, তুরি বসন্ত, কর্নাট, পরিতাল, দক্ষিণান্ত, শ্রী রাগ, চৌক, একতাল প্রভৃতি। আলাওল দামোদরের সঙ্গীত দর্পণ গ্রন্থের অনুসরণে বাদ্যের বৈশিষ্ট্য ও বাদ্য যন্ত্রের পরিচয় সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করেন—

আদ্যে তত বিতত দুয়জে পরিমাণ।
তৃতীয়ে সুষির চারি ঘন হেন জান।।
পঞ্চমে অনাহদ লৈয়া পঞ্চ শব্দ নাম।
কারে কোন শব্দ বলি শুন অনুপাম।
কপিনাস আদি যত তারের বাজন।
তাহাকে বুলিয়ে তত শুন মহারাজ।।
মন্দিরা করিয়া বাদ্য যত তাল ধরে।
সেই সে বিতত জান শব্দ মনোহরে।।
উপাঙ্গ মুরচঙ্গ আদি ফুকে যত বায়।

Dhaka University Institutional Repository

তাহাকে সুষির হেন জান সর্বথায় ।।
মুরজ দুন্দুভি আদি বাদ্য যত চর্ম ।
ঘন হেন নাম ধরে বুঝ তার মর্ম ।।
মুখ হোন্তে উচ্চারয় যতেক শব্দ ।
নিশ্চয় তাহার নাম জানিও অনাহদ ।
এই মতে কহয় সঙ্গীত দামোদরে ।
সঙ্গীত দর্পণ মত শুন কহি তারে ।।[২৯]

সঙ্গীতশাস্ত্র সম্পর্কে এ ধরনের বর্ণনা মূলে নেই। আলাওলের এটা নিজস্ব সংযোজন যা তাঁর সঙ্গীত দর্পণ পাঠের প্রত্যক্ষ ফল। কাব্যে রত্নসেন–পদ্মাবতীর সঙ্গীত চর্চার বর্ণনা আছে। তাঁদের বিবাহোৎসবে 'পঞ্চ শব্দে বাদ্য' বাজানোর উল্লেখ করা হয়েছে—

পঞ্চ শব্দে বাদ্য বাজে ভেউর কর্ণাল গাজে
শানাই বিউগল শিঙ্গা বাঁশী ।
গুরু মাদল মধুবাণী মৃদঙ্গ উপাঙ্গ ধ্বনি
আরগুজা সুষির রাশি রাশি ।।
মুদ্রাকাঁসি করতাল আওয়াজ কর্ণাল ভাল
বিতত বাজয় বহুতর ।
মুরুজ দুন্দুভি জোড়া নাগরা পিনাক কাড়া
ঢাক ঢোল ঘন মনোহর ।।
রবার দোতারা বীণ কপিনাস রুদ্রবীণ
সমগুল বাহে সুললিত ।
তম্বুরা কিঙ্গরি মেলা বিপঞ্চ সুস্বর ভালা
বাজে তত তাল রাগ গীত ।।[৩০]

এ সব বাদ্য যন্ত্রের নাম মূলে নেই; সম্ভবত রোসাঙ্গের কোন বিবাহ উৎসবে এসব বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার প্রত্যক্ষ করেই আলাওল অংশটি সংযোজন করেন। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র ও রাগতাল সমন্বয়ে সঙ্গীত চর্চা করতে দেখে মনে

Dhaka University Institutional Repository

হয় ঐ সময় সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সঙ্গীতের সমাদর ছিল। সঙ্গীতকে তারা বিনোদনের মাধ্যম মনে করত। কবির পৃষ্ঠপোষক মাগন ঠাকুরের রাজসভায় আমরা সঙ্গীত চর্চার পরিচয় পাই—

গুণিগণ থাকন্ত তাহান সভা ভরি
গীত নাট যন্ত্র বাদ্যে রঙ্গ ঢঙ্গ করি।।[৩১]

সঙ্গীত চর্চার উল্লেখ আমরা রাজা গন্ধর্ব সেনের রাজসভায়ও পেয়েছি। সেখানে ধর্ম চর্চার পাশাপাশি সঙ্গীত চর্চাও প্রাধান্য পেয়েছে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় ঐ সমাজের মানুষ যেমন ছিলেন ধর্মাচারী তেমনি ছিলেন সংস্কৃতিবান। সংস্কৃতি চর্চায় তাঁদের উন্নত মনোবৃত্তির পরিচয় পদ্মাবতী কাব্যের বিভিন্ন অংশে পাওয়া যায়—

নানা রাগে নানা ছন্দে কেহ গায় গীত।
কেহ কেহ নানা যন্ত্র বাএ সুললিত।।[৩২]

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সঙ্গীত শাস্ত্রের বিস্তৃত বিবরণ আলাওল ছাড়া অপর কোনো কবির কাব্যে আছে কিনা সন্দেহ।

পদ্মাবতী কাব্যটি আলাওল যে সময়ে রচনা করেন সে সময়ে সাহিত্যে মানব হৃদয়বৃত্তি নিয়ে তেমন আলোচনা দেখা যায় না; দেবতা ও ধর্মনির্ভর কাহিনীর প্রাধান্যই বেশি লক্ষ্য করা যায়। ধর্মাবেগ প্লাবিত দেশে আলাওল রক্তমাংসে গড়া মানব মানবীর সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্না, জন্ম মৃত্যু, বিরহ, মিলন, বিবাহ, আনন্দ উৎসব পার্বণ প্রভৃতির বর্ণনা *পদ্মাবতী* কাব্যে অসাধারণ রচনা শৈলীতে বিনস্ত করেছেন। এগুলো সবই *পদ্মাবতী* কাব্যের সমাজ ও সংস্কৃতির অপরিহার্য উপাদান। কবি অত্যন্ত দরদ দিয়ে সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতিটি বিষয় আলোচনা করেছেন। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করে 'রত্নসেন ও পদ্মাবতী' বিবাহ খণ্ডটি। বিবাহের ব্যাপারে স্বেচ্ছা নির্বাচন বিষয়টি সে যুগে স্বীকৃত ছিল না তবে গন্ধর্ব শাস্ত্র মতে স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করে বিবাহের বর্ণনা অনেক কাব্যে পাওয়া যায়। বিবাহ সংগঠনে মধ্যস্থতা করার জন্য একজন দূত বা মধ্যমণির

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজন হয়। আলোচ্য কাব্যে সে কাজটিতে শুক পাখির ভূমিকা লক্ষ্য করি। সাধারণত দুই পক্ষের সর্বসম্মতি ক্রমে দিন, ক্ষণ, তিথি, লগ্ন দেখে বিবাহের কথা স্থির করা হয়। *পদ্মাবতী* কাব্যটি যেহেতু রাজকাহিনী এবং পাত্র-পাত্রী স্বয়ং রাজপুত্র এবং রাজকন্যা তাই এখানে পাত্রপক্ষের অভিভাবকের সম্মতির উল্লেখ নেই। গন্ধর্ব সেন রত্নসেনের পরিচয় জেনে খুশী হয়ে স্বীয় কন্যাকে তাঁর হাতে সমর্পণ করার সিদ্ধান্ত নেন।

বিবাহ উপলক্ষে যে সব আচার পার্বণ করা হয় তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আমরা আলোচ্য কাব্যে পেয়ে থাকি। পদ্মাবতীর বিবাহ বর্ণনায় যে জাঁকজমকের বর্ণনা আছে তা পুরোটাই বঙ্গীয়, উত্তর ভারতীয় নয়।

বিবাহ বর্ণনায় জায়সী ও আলাওলে পার্থক্য দেখা যায়। জায়সী সমাজসংসার নির্ভর লোকাচারকে প্রাধান্য না দিয়ে যুগলদের রোমান্টিক প্রেমাবেগকে প্রাধান্য দিয়ে তাঁদের বিবাহকে চন্দ্রসূর্যের প্রতীকে আধ্যাত্মিক মনোমিলনের রূপক চিত্র অঙ্কন করেছেন। এ যেন পরমাত্মার সাথে জীবাত্মার মিলন। কিন্তু বাস্তববাদী কবি আলাওল জায়সীর এই আধ্যাত্মিক ভাবনাকে বর্জন করে পুরো অনুষ্ঠানকে যথাসম্ভব লৌকিক এবং বঙ্গীয় বিবাহ রীতি অনুযায়ী বর্ণনা করেছেন। আলাওল হিন্দু বিবাহের সামাজিক আচার আচরণের প্রতি যতটা যত্নশীল ছিলেন, নায়ক নায়িকার হৃদয় ঘটিত রোমান্সের প্রতি ততটা আগ্রহী ছিলেন না। আলাওল প্রায় ছয়শ বছর আগে হিন্দুবিবাহ রীতির যে বর্ণনা দিয়েছেন তা আজও আমাদের সমাজে জীবন্ত। হিন্দু বিবাহের সামাজিক আচার, সংস্কার ও সংস্কৃতির চিত্রকে তিনি এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যা পাঠককে চমৎকৃত করে। একজন সূফী কবির এমন বাস্তব ও রুচিবোধ দেখে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন কবির রুচি বোধে মুগ্ধ হয়ে মন্তব্য করেছেন—

> "কবি একজন প্রবীনা এয়োর মত হিন্দুর বিবাহাদি ব্যাপারে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আচারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন ও পুরোহিত ঠাকুরের মত প্রশস্তি বন্দনায় উপকরণের একটি শুদ্ধ তালিকা দিয়াছেন".... [৩৩]

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত আলাওল রচিত 'রত্নসেন পদ্মাবতী' বিবাহ খণ্ডটি হিন্দু বিবাহ রীতি বর্ণনার একটি নতুন সংযোজন। এর আগে অন্য কোন সূফী কবির কাব্যে এমন নিখুঁত বর্ণনা স্থান পায়নি। কবি এর সাথে যোগ করেছেন বৈষ্ণবীয় রস।

আলাওল রত্নসেন ও পদ্মাবতীকে চন্দ্র সূর্যের প্রতীকে না দেখে রক্ত-মাংসে গড়া এই মর্ত্যের সামাজিক মানুষ হিসেবে দেখেছেন। আলাওলের বর্ণনায় জাঁকজমক যে নেই তা নয় কিন্তু তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন বঙ্গীয় হিন্দুর সামাজিক রীতিনীতি, আচার আচরণ ও প্রথাকে। এটা আলাওলের নিজস্ব সৃষ্টি। তাঁর এ ধারণা শুধু যে জ্ঞানের প্রভায় উজ্জ্বল তা নয় বরং স্নেহ, মায়া, মমতা, আনন্দ, বেদনা এবং সামাজিক রীতিনীতির পরিচ্ছন্ন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় অংশটি ভাস্বর। আলাওল মূলের তত্ত্ব সমৃদ্ধ রূপকের ব্যঞ্জনাকে গ্রহণ করেন নি বরং সামাজিক গৃহগত সৌন্দর্য, স্নেহ বন্ধন, নর নারীর কামনা বাসনাকে সমৃদ্ধ করে 'বিবাহ খণ্ডে' উপস্থাপন করেছেন। তিনি মূলকে একেবারে বর্জন না করে স্বীয় প্রতিভা ও কবিত্ব দিয়ে অনুষ্ঠানটির মনোরম বর্ণনা দিয়েছেন। আলাওল হিন্দু বিবাহ রীতি ও স্ত্রী আচার সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন তা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। গাত্র হরিদ্রা, ষোড়শ মাত্রিকা, পূজা, অধিবাস, বসুধারা, নান্দীমুখ, শ্রাদ্ধ, বর বরণ, কন্যা আনয়ন, শুভ দৃষ্টি, কন্যা সম্প্রদান প্রভৃতি ব্যাপারে কবি বঙ্গীয় সংস্কৃতির পরিচয় দিয়েছেন। রাজকীয় বিবাহ জ্যোতিষ গণনা দ্বারা সম্পন্ন হত। আনন্দ উৎসব হিসেবে গায়ে হলুদ, বর দেখা, মেয়ে নাচ, অধিবাস এবং বিয়ে শেষে চৌগান খেলার প্রচলন ছিল। গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানে আগত অতিথি ও প্রতিবেশীদের পান ও কর্পূর দিয়ে আপ্যায়ন করা হত। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ এ অনুষ্ঠান উপভোগ করত।

জ্যোতিষ গণনা, মঙ্গলাচরণ, স্ত্রী আচার, গান বাজনা, আহার বিহার প্রভৃতি বঙ্গীয় হিন্দু বিবাহ রীতির নিদর্শন—

সিংহল নৃপতি হাঙ্কারিয়া হীরামণি।
আর বহু পণ্ডিত জ্যোতিষগণ আনি।।
শুভক্ষণে শুভলগ্ন করিয়া বিচার।

Dhaka University Institutional Repository

রচিল বিভার কার্য মঙ্গল আচার।।
কর্পূর সংযোগে পান দিল ঘরে ঘরে।
পঞ্চশব্দ বাজন বাজায় মনোহরে।।[৩৪]

বিবাহের পূর্বে বর কনের অধিবাস হত। জাঁকজমকের সাথে এ অনুষ্ঠান পালন করা হত। সাধারণত গোধূলী লগ্ন ছিল এ অনুষ্ঠানের উত্তম সময়—

সন্ধ্যাকালে আদেশ করিল মহারাজে।
স্বর্ণ ঘট প্রদীপ স্থাপিল সভামাঝে
গণেশ আদি পঞ্চদেব পূজিয়া হরিষে।
ষষ্ঠী আর মার্কণ্ড পূজিল তার শেষে।।
তবে গন্ধ অধিবাস কৈল শুভক্ষণে
ললাটে বিংশতি বস্তু ছোঁয়াইল ব্রাহ্মণে।।[৩৫]

এরপর ষোড়শ মাতৃকা, পূজা, নান্দী মুখ শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করা হয়—

প্রভাত সময় নৃপ করিলেক স্নান।
ষোড়শ মাতৃকা পূজা বসুধারা দান।।
নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ সাঙ্গ করিল রাজন।
রত্নসেন যথোচিত করিলা আপন।।[৩৬]

ক্রিয়া শুদ্ধির প্রতীক হিসেবে সমাজে নাপিতের কদর ছিল। যে কোন অনুষ্ঠান পার্বণে ক্রিয়া শুদ্ধির জন্য নাপিতকে ডাকা হত—

নাপিত ডাকিয়া আনি তৃতীয়ে প্রহরে।
করিলা খেউর কর্ম কন্যা কুমাররে।।[৩৭]

বিবাহ সংক্রান্ত আচার পার্বণে বাংলাদেশের সনাতন রীতি ফুটে উঠেছে। বর কন্যাকে স্নান করানোর জন্য এয়োরা পুকুর বা নদী থেকে জল আনে। এয়ো সংখ্যা বিজোড় হতে হবে। কুলায় সাজানো থাকে ধান, দূর্বা, হলুদ, সিদূর মঙ্গল ঘট। এয়োরা জল এনে পুত্র কন্যাকে স্নান করাতেন এবং

Dhaka University Institutional Repository

সুগন্ধি হরিদ্রা ও তৈল দিয়ে শরীর মাজিতেন। স্নানের পর রাজাযোগ্য পোশাক পরাতেন—

কাপড় থাক করিয়া রজক গেল যবে।
আয়ো সবে স্নান করাইতে নিল তবে।।
সুগন্ধি হরিদ্রা তৈলে শরীর মাজিল।
রম্ভাতলে পুষ্কর্ণীতে স্নান করাইল।।
রাজযোগ্য পরাইল বস্ত্র অলঙ্কার।
গীতে নাটে হুলস্থুলি করয় জোকার।।[৩৮]

বিয়ের ছাঁদনাতলা সুসজ্জিত করা হত। চারদিকে চারটি কলা গাছ পোতা হত। আমের ডাল, জলপূর্ণ মঙ্গল ঘট কলসীর মুখে বসানো হত; উপরে থাকত চাঁদোয়া—

"স্বর্ণ ঘট প্রদীপ স্থাপিল সভামাঝে"[৩৯]

কবি অত্যন্ত নিখুঁতভাবে হিন্দু বিবাহের আচার পার্বণ বিশ্লেষণ করেছেন। এ পার্বণ দুটি পর্যায়ে সমাপ্ত হয়েছে। প্রথম পর্ব ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কর্তৃক, দ্বিতীয় পর্ব সধবা ত্রয়ো কর্তৃক। তিনি এত সূক্ষ্মভাবে আচার পার্বণগুলো আলোচনা করেছেন যে, তাঁকে একজন অভিজ্ঞ পার্বণিক বললে ভুল হবে না।

সেকালে বিয়ের বয়স দেখে মনে হয় সমাজে বাল্য বিবাহ জনপ্রিয় ছিল। বাল্যবিবাহে বর কন্যার নির্দিষ্ট কোন বয়সের উল্লেখ কাব্যে নেই তবে যথারীতি পদ্মাবতীর বয়স যখন বার বছর পূর্ণ হলো তখন রাজা অবগত হলেন পদ্মাবতী মিলনযোগ্যা হয়েছেন। কাব্য দৃষ্টে বোঝা যায়, বার বছর বয়সই সেকালে কন্যা বিবাহের উৎকৃষ্ট সময় মনে করা হত। যথানিয়মে পদ্মাবতীকে বার বছর বয়সে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হলো। এটা অবশ্যই বাল্য বিবাহের ইঙ্গিত—

সম্পূর্ণ হৈল যদি দ্বাদশ বৎসর।
হৈল সংযোগ যোগ্য ভাবে নৃপবর।।[৪০]

Dhaka University Institutional Repository

সে কালে পুরুষেরা নারীর মত বিভিন্ন অলঙ্কার পরত এবং যে কোন উৎসব পার্বণে চন্দনাদি ও প্রসাধন দ্রব্য ব্যবহার করত—

রত্নসেন মহারাজ পৈরএ বিচিত্র সাজ
বস্ত্র অলঙ্কারে জয়ে তনু।
মস্তকে কিরিট শোভে দেখি সুরপতি লোভে
জলদ উপরে যেন ভানু।।
চন্দন শোভ এ ভালে মুক্তালোর তাহে দোলে
তারকা বেষ্টিত শশধর।।
.....
শুভযোগে লগ্ন ধরি রত্ন চতুর্দোলে চড়ি
বিবাহ আনন্দে অভিসারে।।[৪১]

রত্নসেন বিবাহের সাজে বস্ত্র অলঙ্কার পরে সজ্জিত হলেন। তাঁর পোশাক হীরা মুক্তা আর মূল্যবান পাথরে খচিত। তিনি মাথায় মুকুট, কপালে চন্দনের ফোটা দিয়ে বর সাজে সজ্জিত হয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাত্রা করে কন্যার বাড়িতে পৌছানোর সাথে সাথে মঙ্গল ধ্বনি বাজতে লাগল। এয়োরা উলুধ্বনি ও নর্তকীরা নাচ গানে মাতিয়ে বরকে বরণ করল—

সুন্দরী সধবা নারী মঙ্গল বিধান করি
সতত করয় উলু উলু।
জয় জয় মহারোল না শুনে কাহার বোল
উৎসব আনন্দ হুলুস্থুলু।।
পঞ্চ শব্দে বাদ্য বাজে ভেউর কর্ণাল গাজে
শানাই বিউগল শিঙ্গা বাঁশী।।
.....
চারি শব্দে মিলি বায় গাইনে সুস্বর গায়
তালে নাচে বেশ্যা নটীগণ।।[৪২]

Dhaka University Institutional Repository

বর বরণ এবং কন্যা ছাঁদনাতলায় আগমনের দৃশ্যটি চমকপ্রদ। বর বরণের সময় অনুষ্ঠাঙ্গনে সাজ সাজ রব ওঠে; সকলের মধ্যে ব্যস্ততা দেখা যায়—

হুলুস্থুল করি বর আইল রাজধানী।
নৃপতি কুমার সবে আগু বাড়ি আনি।।
ছায়ামণ্ডপের তলে বেদিতে বসিল।
আসিয়া কন্যার বাপে বরণ করিল।।
পাদ্য অর্ঘ্য আচমন বস্ত্র অলঙ্কার।
একে একে দিয়া নৃপ কৈল পুরস্কার।।[৪৩]

যথারীতি অর্ভ্যথনার মধ্য দিয়ে বরকে স্বাগত জানানো হলো। ছাঁদনাতলায় বেদিতে বরকে বসতে দেয়া হলো। কন্যার পিতা এসে বিভিন্ন অলঙ্কার অর্ঘ্য ও বস্ত্র দিয়ে বরকে বরণ করলেন।

অলঙ্কারে আকর্ষণ সব সময় নারীর প্রবল ছিল। কনে রূপে সজ্জিত করার সময়ে সাধ্যমত অলঙ্কার প্রদান করা সামাজিক প্রথা ছিল। মর্যাদা সম্পন্ন উচ্চবিত্ত ঘরের কনেকে প্রায় প্রচলিত সকল অলঙ্কারে ভুষিত করা হত। 'পদ্মাবতীর' সাজটিতে এর প্রমাণ মেলে—

বাহু সুলক্ষণ অঙ্গদ কঙ্কণ
রতন বলয়া সাজে।।
অঙ্গুলি চম্পক কলিকা নিন্দক
নব রত্নাঙ্গুরি রাজে।।
মুখর রশন কটিতে ভূষণ
চলিতে সুস্বর বাজে।।
চরণে নেপুর শব্দ সুমধুর
রুনু ঝুনু যেন গাজে।।
.....
অলঙ্কার ধন বর্ণিমু কেমন
সুধা অঙ্গ সুধাময়।।
রূপে আভরণ সহজে মোহন
অধিক অধিক সাজে।।[৪৪]

Dhaka University Institutional Repository

বিবাহ অনুষ্ঠানে অপরূপ সাজে সজ্জিত হওয়া আবহমান বাঙালি কন্যার প্রত্যাশা। বিভিন্ন অলঙ্কার, ফুল ও প্রসাধনী দিয়ে কন্যা সাজানোর রীতি সমাজের একটি প্রথা।

ছাঁদনাতলায় কন্যা আগমনের দৃশ্যটি অত্যন্ত আকর্ষণীয়। এ দৃশ্যটি মূলে নেই। পদটি আলাওলের চমৎকার গীত রচনার নিদর্শন। পদাবলীর প্রভাব পদটিতে লক্ষণীয়—

চলিল কামিনী গজেন্দ্র গামিনী
খঞ্জন গঞ্জন শোভিতা।
কিঙ্কিণী ঘুঁঘুর বাজয় ঝাঁঝর
ঝনাঝন নেপূর মধুর গীতা।।[৪৫]

সখিসহ কন্যার ছাঁদনাতলায় প্রবেশ—

সখী সবে ধরি তোলে রত্নময় চতুর্দোলে।
বর বালা কৈল আরোহণ।
সুচরিতা সখীগণ রূপে মোহে ত্রিভুবন
চারি পাশে করিলা গমন।।
কার হস্তে পুষ্পমালা সুগন্ধি চন্দন ভালা
কার হাতে পুষ্পসার টপে।
.....
মঙ্গল বিধান করি গীত বাদ্য নৃত্যে পূরি
রঙ্গভূমি বাহির হৈল।
করি জয় জয় রোল নামাইল চতুর্দ্দোল
শুভক্ষণে পাটেত তুলিল।[৪৬]

বর বরণ ও কন্যা আনয়ন প্রসঙ্গ অনুবাদে নতুন। যুবরাজ প্রসঙ্গ মূলে অনুপস্থিত। মূলের সপ্তম স্তবক থেকে ভোজন ও সঙ্গীত প্রসঙ্গগুলি অনুবাদে অনুসৃত হয়নি। পরিবর্তে আলাওল নিজস্ব মতামত অবলম্বন করেছেন। জায়সীর বর্ণনায় 'রত্নসেন পদ্মাবতী' বিবাহ খণ্ডের চর্তুদশ ও পঞ্চদশ স্তবক

Dhaka University Institutional Repository

দুটিতে বিবাহ বর্ণনার যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাই সেখানে বেদ পাঠের কথা আছে। বর কনে মালা বদল, পাণিগ্রহণ, গাঁটছড়া বাঁধার এবং সপ্তপদী গমনের মূল কথাগুলি থাকলেও বিশেষ আর কোন সামাজিক আচার আচরণের চিত্র নেই; কারণ সমাজ বাস্তবতার চেয়ে নায়ক নায়িকার হৃদয় সংবাদের দিকেই তাঁর দৃষ্টি বেশি নিবদ্ধ ছিল। কিন্তু আলাওলের কাব্যে সমাজ প্রসঙ্গটি যেহেতু কখনই তুচ্ছ নয় তাই তাঁর বর্ণনায় হিন্দু বিবাহের সামাজিক আচার আচরণ এমনভাবে বর্ণিত হয়েছে যা একজন মুসলমান সূফী কবির পক্ষে সত্যিই বিস্ময়কর। আলাওল মধ্যযুগের প্রেক্ষাপটে সামাজিক বিবাহরীতির প্রতিটি বিষয় অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বর্ণনা করেছেন।

বিবাহ অনুষ্ঠানে 'সাতপাক' পর্বটি কবি চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। ছাঁদনাতলায় আসার পর পদ্মাবতীকে পিঁড়িতে বসানো হলো চারজন পদ্মাবতীকে সহ পিঁড়ি নিয়ে রত্নসেনকে সাত বার প্রদক্ষিণ করে। হিন্দু বিবাহ রীতিতে 'সাতপাক' পর্বটি সবচেয়ে আকর্ষণীয়। কবির বর্ণনায়–

রত্নময় পাটে করি ভব্য চারিজনে ধরি
কন্যা আনি বরের নিকট।
অন্তস্পট মাঝে দিয়া সপ্ত পাক ফিরাইয়া
তুলি ধরি করিলা প্রকট।।
দিব্য পুষ্প লৈয়া করে ছিটয় নাগর বরে
রাজকন্যা শিরের উপরে।
অঙ্গুলি সৌষ্ঠবে ধরি দুই হস্তে নমস্কারি
কন্যা ক্ষেপে বরের যে শিরে।।[৪৭]

সাতপাকে বরকে প্রদক্ষিণ করার সময় চারপাশে দণ্ডায়মান পরিজন বর ও কন্যাকে ফুল ছিটিয়ে স্বাগত জানায়। কন্যা হাত জোড় করে বরকে নমস্কার করে। এ পর্বটা আলাওল এত সুন্দর করে বর্ণনা করেছেন যা দর্শককে আবেগে আপ্লুত করে। প্রায় ছয়'শ বছর আগের এ কাহিনী আজও হিন্দু বিবাহে পালিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সাত পাকের পরের পর্ব শুভ দৃষ্টি। কন্যার ভ্রাতা কর্তৃক মুখাবরণ উন্মোচন করে শুভ দৃষ্টি করানো শাশ্বত বঙ্গীয় রীতিরই বহিঃপ্রকাশ—

ভ্রাতা আসি কন্যা ধরি মুখ পট দূর করি
বলে সমদৃষ্টি হের বালা।
মুখ চন্দ্রিমার কাল প্রেম দৃষ্টি অতি ভাল
জন্মে জন্মে হৌক সুখ মেলা।।[৪৮]

শুভ দৃষ্টির পর মালা বদল পর্ব। এ দৃশ্যটিও অতি চমৎকার—

বর { পুষ্প বৃষ্টি সম্বরিয়া গিম হোস্তে মালা লৈয়া
কন্যা গলে দিলেক রাজন।

কনে { গ্রীবা হোস্তে পুষ্প মালা দুই করে লৈয়া বালা
পতি গিমে করিলা স্থাপন।[৪৯]

বর বরণের পর অগ্নি সাক্ষী পর্বের আয়োজন করা হয়। ব্রাহ্মণ হোম যজ্ঞ করেন—

পঞ্চম বরণ হোম করিলা ব্রাহ্মণে
জয় হোম লাজ হোম করি তার পরে।
সপ্তপদী গমন করিল কন্যা বরে।।
দম্পতি দাঁড়াইয়া পূর্ণাহূতি দিল যবে।
ব্রাহ্মণেরে যজ্ঞের দক্ষিণা দিল তবে।।[৫০]

ব্রাহ্মণ হোম যজ্ঞ করলেন; এটাই হচ্ছে অগ্নি সাক্ষী পর্ব। জয়ধ্বনি ধ্বনিত হলো। নবদম্পতি দাঁড়িয়ে পূর্ণাহূতি দিল। ব্রাহ্মণকে যজ্ঞের দক্ষিণা দেয়া হলো।

বিবাহ অনুষ্ঠানে কন্যাসমর্পণ পর্বটি হৃদয় বিদারক; এতদিনের স্নেহ লালিত্যে পালিত কন্যাকে পিতা জামাতার হাতে সমর্পণ করেন। পদ্মাবতী কাব্যে রীতিটি একেবারেই বঙ্গীয়—

Dhaka University Institutional Repository

বর কন্যা নামাইয়া দ্বিজ পুরোহিত।
আনল স্থাপন কৈলা শাস্ত্রের বিহিত।।
তখনে কন্যার বাপে পূর্ণ ঘট আনি।
বর-হস্ত পরে তুলি কন্যা হস্তখানি।।
পঞ্চ হরিতকী লৈয়া এ পঞ্চ মানিক।
কুশ লইয়া হস্তযুগ বান্ধিলা খানিক।।
কুশ তিল তুলসী লইয়া নৃপবরে।
কন্যা উৎসর্গিয়া দান কৈলা জামাতারে।।
সজল নয়নে রাজা কন্যা সমর্পিল।
বোলে মোর প্রাণ আজি তোমা হস্তে দিল।।[৫১]

গন্ধর্ব সেন পূর্ণ ঘট নিয়ে জামাতার হাতের উপর কন্যার হাত রেখে পাঁচটি হরিতকী হাতের উপর রেখে কুশ দিয়ে জামাতা ও কন্যার হাত কিছুক্ষণের জন্য বাঁধলেন। তারপর সাশ্রুনয়নে জামাতার হাতে কন্যা সমর্পণ করলেন। ছাঁদনাতলার পর্ব এ পর্যায়ে শেষ। এরপর স্ত্রী আচার পর্ব—

ঘরে নিয়া সুভব্যা সধবা নারীগণ
স্ত্রীআচার করিলেক করিয়া বরণ
পঞ্চগ্রাসী করাইয়া মন কুতুহলে।
প্রেমগাঁঠি বান্ধিলেক আঞ্চলে আঞ্চলে।।
হরষিতে দম্পতি রহিলা অন্তঃপুরে।
নৃপকুল জ্ঞাতিকুল ভুঞ্জয়ে বাহিরে।।[৫২]

বিবাহ সমাপ্তির পর বর কন্যাকে ঘরে নিয়ে এয়োরা এক প্রকার খেলার আয়োজন করে। বর ও কন্যার আঁচলে প্রেমকাঠি বেঁধে দেয়া হয়। বর কন্যা এয়োদের নির্দেশ অনুযায়ী খেলা করতে থাকে। এয়োরা এ খেলার মধ্য দিয়ে বর কন্যার পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা ও মমত্ববোধ পরীক্ষা করেন। এ খেলাটি সাময়িক আনন্দ দানের মাধ্যম ছাড়া আর কিছুই নয়।

Dhaka University Institutional Repository

রত্নসেন-পদ্মাবতী বিবাহ বর্ণনায় একদিকে নৃত্যগীত ও বাদ্যের বিবরণ অপরদিকে আতসবাজি পোড়ানোর বর্ণনা মধ্যযুগের সামন্ত নৃপতির বিবাহ বর্ণনার অনুরূপ। বিশেষ করে বিবাহ শোভা যাত্রায় নর্তকীর নৃত্য পরিবেশনে পূর্বোক্ত সংস্কৃতি চিহ্নিত —

নানাবর্ণ বাজি পোড়ে অনেক হাউই উড়ে
গাছ বাজী আর উড়ে ঘন
দীপ্তি অতি মনোহর অগ্নিবৃষ্টি শূন্য পর
যেন স্বর্গ ভ্রষ্ট তারাগণ।।[৫৩]

বিভিন্ন প্রকার বাজি পুড়িয়ে ও হাউই উড়িয়ে যুব সমাজ বর পক্ষকে সাদর সম্ভাষণ জানাত।

বাদ্য বাজার সাথে তালে তালে নর্তকীরা নৃত্য পরিবেশন করে অনুষ্ঠানটিকে আরও আনন্দ মুখর করে তুলত—

চারি শব্দে মিলি বায় গাইনে সুস্বর গায়
তালে নাচে বেশ্যা নটীগণ।
পায় দক্ষিণান্ত নাচে নানাছন্দে নানাকাচে
হস্ত নৃত্য সাধন মিলন।।[৫৪]

আলাওল রোসাঙ্গ নগরীর একজন বাঙালি মুসলিম ও সূফী কবি। তাঁর রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানে বর্ণিত প্রতিটি চরিত্রই বাঙালি সমাজের প্রতিনিধি। চরিত্রে তিনি বাঙালি সমাজ ও সামাজিক আচার আচরণ ও প্রথার সমন্বয় ঘটিয়েছেন। আলাওল যে সময়ে কাব্যটি রচনা করেন সে সময়ে দেবতা ও ধর্মনির্ভর সাহিত্য বেশি লক্ষ্য করা যায়। মানব মনস্তত্ত্ব নিয়ে কেউ তেমন আলোচনা করেন নি। আলাওল এই চিরাচরিত প্রথা ভেঙ্গে সম্পূর্ণ নতুন ধারায় কাব্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। তিনি এই ধরনীর রক্তমাংসে গড়া মানুষের হৃদয় বৃত্তি নিয়ে কাব্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাই তাঁর কাব্যে মানব জীবনের সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্না, আনন্দ-বেদনা, প্রেম বিরহ ও মিলনের সমন্বয় দেখতে পাই। তিনি

Dhaka University Institutional Repository

সুদুর আরাকানে বসে সিংহল ও চিতোরের কাহিনী এমন দরদ দিয়ে বর্ণনা করেছেন, মনে হয় উপাদানগুলি তিনি বাংলাদেশ হতেই সংগ্রহ করেছেন। কাব্যের প্রতিটি খণ্ডেই এর প্রভাব লক্ষণীয়। হতে পারে এটা কবির অভিজ্ঞতাজাত। বাঙালি চরিত্রকে তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করে কাব্যে উপস্থাপন করেছেন এ জন্যই প্রতিটি চরিত্র এত জীবন্ত এত সজীব। রত্নসেন সস্ত্রীক সিংহল দ্বীপ হতে চিতোর অভিমুখে যাত্রাকালে পদ্মাবতীকে শ্বশুর বাড়ি পাঠানোর দৃশ্য কবি মর্মস্পর্শী করে বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনার মধ্য দিয়ে তিনি বাঙালি সমাজের নিত্যকালের ছবি অঙ্কন করেছেন। সিংহল রাজকন্যাকে পতিগৃহে পাঠাতে গিয়ে তিনি নিজেও কেঁদেছেন, অন্যকেও কাঁদিয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি বাঙালি সমাজ জীবনের কঠিন অন্তর্বেদনাকে তুলে ধরেছেন—

গমনের কাল যদি নিকট হইল।
পদ্মাবতী সখীগণ সব আনাইল।
একে একে গলে ধরি কান্দে বরবালা।।
সকল ছাড়িয়া আমি যাইমু একেলা।।
ছাড়িল মা বাপ ঘর বান্ধব সমাজ।
একেশ্বরী হইয়া চলিল ভিন্ন রাজ।।
.....
যেই দিন লাগি সখী ছিল মনে ভিত।
সেই দিন আসিয়া হইল উপস্থিত।
এতদিনে ছাড়িলু সিংহল কবিলাস।
বিধিবশে হৈল মোর দূর দেশে বাস।।
পরদেশী হৈলুঁ বলি দয়া না ছাড়িও।
অবশ্য বারেক মোরে স্মরণ করিও।।
তুমি সব ভাগ্যবতী রহিলা স্বদেশ।
মোর মনে রহিলক জনম ভরি ক্লেশ।।
আশীর্বাদ আমারে করিও এক মনে।
সতত পিরীতি যেন থাকে স্বামী সনে।।[৫৫]

Dhaka University Institutional Repository

পদ্মাবতীর শ্বশুরবাড়ি যাত্রার দৃশ্যটি কবি এমন সংবেদনশীল হৃদয় দিয়ে এঁকেছেন যা আমাদের মর্মকে স্পর্শ করে। জীবনমুখী এ বাস্তবদৃষ্টি আলাওলের মত হৃদয়গ্রাহী করে আর কেউ বর্ণনা করেন নি।

'রত্নসেন বিদায়' খণ্ডে পদ্মাবতীর বিলাপ, রাজমাতার উপদেশ এবং কন্যা সমর্পণ কালে রাজার অন্তর্বেদনার মধ্য দিয়ে বঙ্গীয় সমাজ সংসারের বাস্তব চিত্রই প্রতিফলিত হয়েছে।

শুভক্ষণে কন্যাকে বিদায় দিতে জ্যোতিষীর আগমন উল্লেখ আছে—

(১) জ্যোতিষী দৈবজ্ঞ সব ডাকিয়া আনিলা।
দিনক্ষণ যোগিনী সুলগ্ন বিচারিলা।।[৫৬]

(২) পশ্চিমে উত্তরে নৃপ করিব গমন।
বৃহস্পতি উষাকালে দিলেক লগন।।[৫৭]

কন্যা পতিগৃহে যাত্রাকালে রাজমাতার উপদেশ কবির অভিজ্ঞতাজাত যা শাশ্বত বাঙালির সমাজ ও জীবনের সাথে সম্পৃক্ত। কবির এ অভিজ্ঞতার মধ্যে সাংসারিক জ্ঞানের পরিচয় বিধৃত যা বঙ্গীয় মানসিকতারই বহিঃপ্রকাশ। আশৈশব স্নেহে লালিত কন্যাকে সমস্ত রীতি-নীতি ও ধর্ম শিক্ষা দিয়ে সে যুগের বাঙালি জনক-জননী যখন জামাতার হাতে কন্যাকে তুলে দিতেন—তখন তাদের একমাত্র উপদেশ ছিল পতিসেবা—

কন্যাকে তুলিয়া ধরি রাজমহাদেবী।
গলাগলি করি কান্দে মনে শোক ভাবি।।
বিস্তর কান্দিয়া দেবী বলে সকরুণে।
কন্যা গৃহে অবতার দুঃখের কারণে।।
.....
মুছিয়া চক্ষের জল চুম্বিয়া কপালে।
সান্তাইয়া দুহিতারে উপদেশ বলে।।
এক মনে শুন মাও আমার বচন।

Dhaka University Institutional Repository

তোমা সম ভাগ্যবতী আছে কোন জন।।

.....

স্বামী তোর মহারাজা ইন্দ্রের সমান।

প্রাণের অধিক স্নেহ করে তোর পতি।।

.....

সহস্র সতিনী হৈলে তাতে কিবা ডর।

না হইব তোর সখিজন সমস্বর।।[৫৮]

পদ্মাবতীর পতিগৃহে যাত্রাকালে যে হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল তার সাথে কালিদাসের অভিজ্ঞান *শকুন্তলম্* নাটকের সাদৃশ্য পাই। শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রাকালে কণ্বমুণির হৃদয়ের অভিব্যক্তিরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে গন্ধর্ব সেনের হৃদয়ে। এ আর্তনাদ শুধু কণ্বমুণি কিংবা গন্ধর্ব সেনের নয়, এ আর্তনাদ বাঙালি পিতৃসমাজের সকলের। সে দিন কণ্বমুণি যেভাবে দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে শকুন্তলাকে উপদেশ দিয়েছিলেন তারই প্রতিফলন দেখি গন্ধর্ব সেনের উপদেশে।

নারীর অলঙ্কার বাহুল্য সব সময় সমাজে স্বীকৃত। কোন অনুষ্ঠান পার্বণ উপলক্ষে তো বটেই, এছাড়া স্বামী সান্নিধ্যে যাবার সময় নারীরা বিভিন্ন অলঙ্কার ও প্রসাধনী দিয়ে নিজেদেরকে সজ্জিত করত। *পদ্মাবতী* কাব্যেও সেকালে প্রচলিত অলঙ্কার ও প্রসাধন দ্রব্যের বিচিত্র তালিকা সংগ্রহ করা যেতে পারে যা তৎকালীন সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট। নায়িকার রূপ বর্ণনা এবং বিবাহ বর্ণনা অধ্যায়ে বসন, ভূষণ ও অলঙ্কারের যে বিবরণ দেখি তা থেকে মনে হয় যে যুগে সমাজে অলঙ্কারের প্রচলন খুব বেশি ছিল। সেকালে পরিধেয় অলঙ্কারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– কানে কুণ্ডল ও খুঁট, নাকে ফুল বা বেশর, গলায় গজমতি হার (মণিমুক্তা খচিত), হাতে কাঁকন বাহুতে বহুটা বা বাউটি ও টাঁড়, হাতের চেটোয় পদ্মকলির ন্যায় অলঙ্কার, আঙ্গুলে অঙ্গুরীয়, কোমরে ক্ষুদ্র ঘন্টিকা বা বিছে, পায়ে পায়েল বা মল প্রভৃতি।

Dhaka University Institutional Repository

পদ্মাবতী কাব্যে আলাওল বসনের যে তালিকা দিয়েছেন তা মূল থেকে স্বতন্ত্র। জায়সী পদ্মাবতীর জন্য চাঁদনৌতা, বাঁশপূর, ঝিলমিল, খরদুক, পেচমা, ডরিয়া, চৌধারী প্রভৃতি বসন আমদানীর উল্লেখ করেছেন। আলাওল পদ্মাবতীর রূপবর্ণন খণ্ডে শুক মুখে পদ্মাবতীর রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে যে স্তবকটি যোগ করেছেন সেখানে পদ্মাবতীর বসনের তালিকা আছে। জরতরি, রমাপতি, গঙ্গাজল, কিরিমিজি, মল-মল, ঝিলিমিলি, মেঘডুম্বুরী প্রভৃতি তৎকালে প্রচলিত বসন হিসেবে অভিজাত সমাজে প্রচলিত ছিল। ভূষণ বর্ণনার ক্ষেত্রে আলাওল একেবারেই মূলানুসারী তবে নিম্নলিখিত কনের সাজটি আদর্শায়িত হলেও আলাওলের নিজস্ব রচনা—

কিঙ্কণী ঘুঁঘর বাজয় ঝাঁঝর
ঝনঝন নেপূর মধুর গীতা।।[৫৯]

সেকালে সুন্দরীরা অর্ধচন্দ্র আকৃতির কবরী বাঁধত। কবরীতে মুক্তা, ফুল জড়িয়ে দিত। অলঙ্কার ও পোশাক পরিধানের পর বিভিন্ন প্রসাধনী ব্যবহার করত। চোখে অঞ্জন, কপালে সিন্দূর, কপালে কপোলে চন্দন তিলক এবং সর্বাঙ্গে অগুরু-চন্দন দিয়ে সুগন্ধ ছড়াত। অধর লাল করার জন্য তাম্বুল ও মৃগমদ কুমকুম ছিল প্রসাধনের অপরিহার্য উপাদান—

বিচিত্র বসন পরি লেপিত চন্দন।
সীমান্তে সিন্দূর পরি তিলক ললাটে।
সূর শশী সমুদিত বিধূন্য নিকটে।।
শ্রবণে কুণ্ডল দিয়া নয়ানে আঞ্জন।
বেসররঞ্জিত নাসা জড়িত রত্তন।।
রাতুল তাম্বুল রাগে সুরঙ্গ অধর।
গীমে সপ্তছরি হার অতি মনোহর।।
অঙ্গের বলয়া আদি করেতে কঙ্কণ।
রুনু ঝুনু বাজে কটি শুনিতে শোভন।।
নেপুর পায়রি আদি চরণে রঞ্জিত।
বার আভরণ নাম শুনহ নিশ্চিত।।[৬০]

Dhaka University Institutional Repository

আলাওল যেহেতু বাঙালি কবি তাই কাব্যের প্রতিটি চরিত্রে বাঙালির নিজস্বতা লক্ষণীয়। সিংহল দ্বীপের সুন্দরীদের উদ্দেশ্যে কবির মন্তব্য—

(১) শিরেতে কুসুম্ভী চীর মুখেতে তাম্বুল।
রতনে জড়িত কর্ণে শোভে কর্ণফুল।।[৬১]

(২) সরোবরে আসিয়া পদ্মিনী উপস্থিত।
খোঁপা খসাইয়া কেশ কৈল মূকুলিত।।[৬২]

এসব দৃশ্য বাঙালি সমাজে নতুন নয়। এ তো বাংলাদেশের সামাজিকতা। কাপড়ের আবরণে মস্তক আবরিত করা, পান দিয়ে ওষ্ঠ রাঙানো, কর্ণ বৃন্তে কানফুল, সরোবরে খোঁপা খুলে স্নান করা বাঙালি নারীদের একটি প্রচলিত প্রথা– এ প্রথা সিংহল দ্বীপের নারীদের মধ্য দিয়ে কবি যেন বাঙালি নারীর বৈশিষ্ট্যই তুলে ধরেছেন।

মধ্যযুগে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন খুব বেশি না থাকলেও অভিজাত বা সামন্ত সমাজে প্রচলিত ছিল। নারী শিক্ষাও একেবারে বিরল ছিল তা নয়। উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত সমাজে পাঁচ বছর বয়স হলেই বিদ্যার্থিদের গুরুগৃহে টোলে ভর্তি করা হত। অভিজাত সম্প্রদায় গৃহে পণ্ডিত রেখে শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা করতেন। পদ্মাবতী ও রত্নসেনকে গৃহে পণ্ডিত এনে শিক্ষা দানের ব্যবস্থার উল্লেখ আছে। তাঁদেরকে নানা শাস্ত্রে শিক্ষা দেয়া হত। সূত্র বৃত্তি, পঞ্জিকা, পুরাণ, বেদ, ব্যাকরণ, অভিধান, তর্কশাস্ত্র, অলঙ্কারশাস্ত্র, সঙ্গীতশাস্ত্র সেকালে অভিজাত সমাজে প্রচলিত ছিল। লেখার উপকরণ হিসেবে তালপত্র, ভূর্জপত্র, বাকল, তুলট কাগজ প্রভৃতির প্রচলন ছিল—

মহান পণ্ডিত হৈল কন্যা গুণবান।
চতুর্দিকে নৃপগণে শুনিলা বাখান।।
সিংহলনগর রাজকন্যা পদ্মাবতী।
মোহন সুরুপ সুপণ্ডিতা গুণবতী।।[৬৩]

Dhaka University Institutional Repository

খেলাধুলা সর্বকালের সর্বশ্রেণীর মানুষের চিত্ত বিনোদনের একটি অন্যতম মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত। পাশা খেলা সর্বস্তরের মানুষের প্রিয় ছিল। বিবাহানুষ্ঠানে বর কনে মিলে পাশা খেলার রীতি ছিল। রত্নসেনের অশ্বক্রীড়া প্রদর্শন ও পোলো খেলায় জয়লাভ চৌগান খণ্ডের মূল বিষয়। আলাওলের সময়ে রাজ পরিবারে অশ্বচালনা অত্যাবশ্যক ছিল। রাজপুত্রের অশ্বচালনায় পারদর্শিতা অর্জন করা অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হত।

সিংহল দ্বীপে রত্নসেনকে এ যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হয়েছিল। তিনি বিভিন্ন ভঙ্গিতে যেমন– দোগাম, সাহ, গোমসাম, রফা, বোহা প্রভৃতি চালে অশ্ব চালিয়ে সিংহল বাসীকে মুগ্ধ করেন–

নৃপতির আরতি বুঝিয়া রত্নসেনে।
চড়িয়া ফিরায় অশ্ব বিবিধ বিধানে।।
প্রথমে দোগাম চালি সাহা গোমগাম।
.....
বোহা আর সপ্তচালি চালাইল সকল।
না নড়ে অঙ্গের মাক্ষি উদরের জল।।[৬৪]

আলাওলের কাব্যে যে সব যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো রামায়ণ ও মহাভারত যুগের। শুল, গদা, মুষল, তাসি, খঞ্জর, বিভিন্ন প্রকার ধর্নুবান, অগ্নি সিংহ, সর্বচন্দ্র, অর্ধ চন্দ্র, বরুণ ইত্যাদি।

যাতায়াতের বাহন হিসেবে নৌকা ও ঘোড়ার উল্লেখ পাই এবং যুদ্ধ বাহনের মধ্যে অশ্ব, গজ, রথ ও যুদ্ধ বাদ্য—

হস্তী সঙ্গে হস্তীর বাজিল দড়মড়ি।
যেন দুই পর্বতে পর্বতে জড়াজড়ি।।
দন্তে দন্তে বাজি দন্ত ভাঙ্গিয়া উড়ায়।
যার গায়ে লাগে সেই ভূমিত পড়য়।।
এক গজে আর গজে ঠেলি লইয়া যায়।
চূর্ণীকৃত হয় নর তার পদঘায়।।[৬৫]

Dhaka University Institutional Repository

যুদ্ধ বর্ণনায় পৌরাণিক প্রভাব অর্থাৎ কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারতের প্রভাব লক্ষণীয়।

প্রত্যেক সমাজে কিছু অন্ধ বিশ্বাস, সংস্কার ও নিয়তি নির্ভর এর প্রভাব দেখা যায়। *পদ্মাবতী* কাব্যেও আমরা এসব সংস্কারের প্রভাব লক্ষ্য করি। তারা যাদু, টোটকা চিকিৎসা, পানি পড়া, তেল পড়া, চাল পড়া, ঝাড় ফুক প্রভৃতি বিশ্বাস করত। পদ্মাবতী কাব্যে 'শুকখণ্ডে' শুক পাখির মুখে আমরা শুনতে পাই—

শুকে বোলে শুন রে বান্ধব পক্ষিগণ।
ললাট লিখন দুঃখ না যায় খণ্ডন।।[৬৬]

রত্নসেন ও পদ্মাবতী মূর্ছিত হলে তাঁদের চিকিৎসার বা সেবা শুশ্রূষার জন্য যে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল তাতে সে যুগের কবিরাজী চিকিৎসার ইঙ্গিত পাই-

বৈদ্য ওঝা গারুড়ী আইল বহু গুণী
কেহ নাড়ী চাহে কেহ নাসিকা পবন
কেহ ঘরিষয় হস্তে যুগল চরণ।
পরীক্ষিয়া নাসিকা চাহিলো গুণিগণে।
নিরমল চন্দ্র সূর্য আপনা ভুবনে।
সঞ্চার নাহিক তিন কফ বাত পিত।
.....
কোন রোগ নহে এই বিরহ বিকার।।[৬৭]

পদ্মাবতী মূর্ছিত হলেও তার সখীরা নানা প্রকার ভেষজ তেল ও সুগন্ধি দিয়ে গা মালিস করে সুস্থ করে তোলে—

কোন সখী পাক তৈল শিরেত ঢালন্ত।
কেহ কেহ হস্তে পদে তৈল ঘসি দেন্ত।।
কেহ আনি অঙ্গে সিঞ্চে শীতল চন্দন।
বিচনী আনিয়া কেহ দোলায় পবন।।

Dhaka University Institutional Repository

কোন সখী শুদ্ধ জল আনি দেন্ত মুখে।
নাসা আগে হস্ত দিয়া কেহ শ্বাস লখে।।
নানামত প্রকার করিলা সখীগণ।
কোন পরকারে কন্যা না হৈল চেতন।।[৬৮]

সমাজে আরও কিছু কুসংস্কার ছিল তার মধ্যে অন্যতম হলো বিবাহ অনুষ্ঠানে বিধবা নারী বর্জন। বিধবারা অনুষ্ঠানে অংশ নিলে অমঙ্গল মনে করা হত। এ জন্য বিবাহের সমস্ত আচার পার্বণে অংশ গ্রহণের জন্য সধবা নারীদের আমন্ত্রণ জানানো হত—

পাত্র পুরোহিত নারী ব্রাহ্মণী সজজনী।
সুকুলিনী সধবা সুবেশা রমণী।।
নৃপ গৃহে আসি মহাদেবী অনুমতি।
আয়ো শয্যা কৈল সবে হরষিত মতি।।
বেলি অবশেষে মিলি যুবতী সকলে।
বর কন্যা স্নান করাইল কুতুহলে।।[৬৯]

সহমরণ প্রথা নামে সমাজে করুণ ও হৃদয়বিদরক একটি সংস্কার তৎকালে প্রচলিত ছিল। মধ্যযুগের অনেক কাব্যে সহমরণ প্রথার উল্লেখ আছে। সাধারণত সংস্কারবশতঃই এ প্রথাটি সমাজে চালু ছিল। আলাওলের কাব্য পাঠেও আমরা সহমরণ প্রথার ধারণা পাই। স্বেচ্ছায় বধূরা মৃত স্বামীর চিতা আরোহণে প্রাণ বিসর্জন দিত। যে ধর্মীয় প্রেরণাটি এক্ষেত্রে কাজ করত তা হলো—

"পতিবিনে আর গতি নাহি নারী কূলে।"[৭০]

পতিবিহীন জীবন তারা অনর্থক মনে করত। *পদ্মাবতী* কাব্যে আমরা পদ্মাবতী ও নাগমতিকেও রত্নসেনের চিতায় সহমৃতা হতে দেখি—

পদ্মাবতী বোলে সখী শুন মোর বাণী।
সংসারেত একাকিনী হইল দুঃখিনী।।
সিংহলের যত সুখ জনক জননী।

Dhaka University Institutional Repository

তেজিয়া সকল সুখ আইল একাকিনী ।।
যার প্রেমরসে মোর মন বশ কৈল ।
সে পুনি ছাড়িয়া আমা স্বর্গবাসী হইল ।।
তেকারণে মৃত্যু হই পতি সঙ্গে যাইমু ।
আজন্ম বিচ্ছেদ তার সংহতি হইমু ।।[৭১]

পদ্মাবতীর সহমৃতা হবার অভিপ্রায় শুনে নাগমতিও স্বামীর চিতায় নিজেকে আত্মাহুতি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন—

এতেক শুনিল যদি নাগমতি রাণী ।
পতি সঙ্গে যাইবেক আপনা সতিনী ।।
সে পুনি চিন্তিলা মনে হই একাকিনী ।
বঞ্চিমু কাহার সনে বিধবা দুঃখিনী ।।
মৃত্যুপাশ হোন্তে উঠি গেল নিজ স্থান ।
নিজ অলঙ্কার সাজ আনি তুরমান ।।
মন দুঃখে নাগমতি সাজিলা তুরিত ।
স্বামী পাশে আসি সতী হইলা উপস্থিত ।।[৭২]

চিতাসজ্জা সাধারণত কাষ্ট দিয়ে করা হত। উচ্চবিত্ত এবং অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা অবশ্য চন্দন কাষ্ট দিয়ে চিতা সাজাত। উচ্চবিত্তেরা কাষ্ট সজ্জিত চিতায় অতিরিক্ত অগ্নি উৎপাদনের জন্য ঘৃত ব্যবহার করত। সে কথার ইঙ্গিত মেলে পদ্মাবতী ও নাগমতির সতীত্ব পরীক্ষণ উদ্দেশ্যে নির্মিত অগ্নিকুণ্ডে পর্যাপ্ত ঘৃত ব্যবহারে—

তবে চন্দনের কাষ্ঠ আনি বহুজনে ।
উপরে স্থাপনা কৈলা বিষাদিত মনে ।।
শত শত পুরোহিত ক্ষেত্রিজ ব্রাহ্মণ ।
পুরাণ বেদের মন্ত্র করেন্ত জপন ।।
শতে শতে ঘৃত ঘট সম্পূর্ণ ভরিয়া ।
কাষ্ঠপরে ঘৃত ঘট দিলেক ঢালিয়া ।।[৭৩]

Dhaka University Institutional Repository

যাত্রার শুভাশুভ নির্ণয়েও কুসংস্কার মেনে চলার রীতি ছিল। রত্নসেন ও পদ্মাবতীর চিতোর গমন উপলক্ষে জ্যোতিষীর আগমন এর প্রমাণ দেয়: জ্যোতিষী নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন—

শুক্র রবি পশ্চিমেতে গমন কঠিন।
গুরুবারে সিদ্ধি নাই গমন দক্ষিণ।।
সোম শনি পূর্বে না যাইব কদাচন।
উত্তরে মঙ্গল বুধে অশুভ লক্ষণ।।[৭৪]

এই অমঙ্গল থেকে পরিত্রাণের জন্য জোতিষী নিম্নের বিধান অনুযায়ী চলার পরামর্শ দিয়েছেন—

শুক্রেত পশ্চিমে যাইতে মুখে দিব রাই।
বৃহস্পতি দক্ষিণে চলিব গুড় খাই।।
উত্তরেত মঙ্গলে ধনিয়া মুখে দিব।
দর্পণ দেখিয়া সোম পূর্বেতে যাইব।
বরিবারে পশ্চিমে তাম্বুল দিবা মুখে।
বায়ু ভক্ষি শনিবারে পূর্বে চল সুখে।।
বুধবারে উত্তরে যাইতে খাইব দধি।
বিচারি কহিল সপ্ত দিবস ঔষধী।।[৭৫]

কবি সিংহল দ্বীপের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা শ্রীলংকার নয় বাংলাদেশের নিসর্গ প্রকৃতির বর্ণনা। *পদ্মাবতী* কাব্যে বর্ণিত ফুল ফল ও পাখির যে বর্ণনা পাই তাতে আমাদের বাংলাদেশের অতি পরিচিত ফুল ফল ও পাখির বর্ণনা প্রকাশ পায়—

মনোহর উদ্যান যে পুষ্প চারিপাশ।
বৃক্ষ সব ভেদি হৈল চন্দন সুবাস।।
আমোদিত মরুবক সুগন্ধি মালতী।
লবঙ্গ গোলাপ চম্পা শতবর্গ যুথি।।
কেতকি কেশর বৈজয়ন্তী বেলফুল।
রঙ্গন কাঞ্চন জাতি মাধবী বকুল।।[৭৬]

Dhaka University Institutional Repository

যে বিচিত্র ফুল এবং ফুলের বাগানের বর্ণনা কবি *পদ্মাবতী* কাব্যে দিয়েছেন তাতে বাংলাদেশের ফুলের বাগানের প্রতিচ্ছবি প্রত্যক্ষ করি। এ থেকে মনে হয় কবি অত্যন্ত দরদ দিয়ে কাব্যটি হৃদয়গম করে অনুবাদ করেছেন। ফুলের বর্ণনা হতে সে যুগের মানুষের ফুলের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ পাই—

মনোহর উদ্যান কহিতে নাহি অন্ত।
ফলফুলে ষড় ঋতু সদাএ বসন্ত।।
ফলভরে নম্র অতি আম্র কাঠোয়াল।
বড়হ খিরিনী খাজুর আর তাল।।
গুয়া নারিকেল ফল ডালিম্ব ছোলঙ্গ
নারঙ্গ কমলা শ্যামতারা কামরঙ্গ।।
জামির তুরঞ্জ দ্রাক্ষা মহুয়া বাদাম।
বেল শ্রীফল সদাফল কলা জাম।।
হালফা রেউড়ী আর করঞ্জা তুতই।
আখরোট ছোহারা গুয়া জলপাই।।[৭৭]

ফলের বর্ণনাতেও কবি একান্তভাবেই বঙ্গীয়। বাংলাদেশে ষড় ঋতুর পরিক্রমায় যে সব ফলের সমারোহ দেখি কবি যেন তারই সাদৃশ্য এনেছেন সিংহল নগরে বর্ণিত ফলের মধ্যে।

পাখির বর্ণনায় কবি আমাদের অতি পরিচিত পাখির সাদৃশ্য দেখিয়েছেন—

হংস চক্রবাক আদি চরে জলচর
সিতাসিত রক্তপীত নানা বর্ণধর।
.....
সংকট শালিক আর ডাহুক জলকাক।
করন্ডক বক শ্বেত শুক ঝাঁকে ঝাঁক।।
অমূল্য রতন মুক্তা বৈসে সেই জলে।
মজ্জিয়া ডুবিলে মাত্র পায় ভাগ্যবলে।।[৭৮]

Dhaka University Institutional Repository

আলোচ্য কাব্যে কবি পাখির যে বর্ণনা দিয়েছেন তা মূলত বঙ্গীয়। বাংলাদেশে প্রায় সর্বত্রই এ সব পাখি প্রত্যক্ষ করা যায়।

এছাড়া দিঘি এবং পুষ্করিনীর যে বর্ণনা আছে সে গুলো এখন বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বিদ্যমান। পদ্ম এবং শাপলা ফুল ফুটে পুকুরের শোভা বর্ধন করে। ফুলের পাতাগুলো মনে হয় ভাসমান ছাতা। এ দৃশ্য আমাদের অতি পরিচিত ও আপন। দিঘির জলে মাছ কেলি করে—

সরোবরে নামি জল তোলএ জীমূত।
উথলয় মৎস্য যেন চমকে বিদ্যুৎ।।[৭৯]

পদ্মাবতী কাব্যে খাবারের বর্ণনার মধ্যে বাঙালিত্ব প্রকাশ পায়। ভাত, মাছ, রুটি, পুরি নানা প্রকার নিরামিষ ব্যঞ্জন, মাংস, চাটনি এগুলো সবই বাঙালির অতি পরিচিত এবং প্রিয় খাবার। পানীয় হিসেবে তৎকালে শরবত দেয়ার প্রচলন ছিল। আহারের পর মুখ শুদ্ধির জন্য পান, সুপারি দেয়া হত। অভিজাত সমাজে পানের সাথে কর্পূর দেয়ার প্রচলন ছিল।

মানব জীবনের বাস্তব স্বরূপ বিশ্লেষণে যুগের প্রভাব অপরিশোধ্য। বাস্তবিকই আলাওল যে জীবন ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন সে জীবন অভিজাত, ঐশ্বর্যশীল এবং ভোগ বিলাসময়। বাইরের সংঘাতে নিরাপত্তা জনিত সমস্যা ছাড়া অন্তর্জীবনে তেমন কোন দ্বন্দ্ব, সংকট ও বিঘ্ন ছিল না। যেহেতু *পদ্মাবতী* কাব্যটি রাজা বাদশাহর প্রেম কাহিনী নিয়ে রচিত। তাই স্বেচ্ছা প্রাধান্যতা এখানে বেশি পরিলক্ষিত হয়। শুক মুখে পদ্মাবতীর রূপের কথা শুনেই রত্নসেন যোগী বেশে চিতোর অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁর প্রথমা সহধর্মিণীর অন্তর্বেদনাকে প্রাধান্য দেয়া হয়নি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ইঙ্গিত এ কাব্যে বহু স্থানে প্রত্যক্ষ করি। তাই রত্নসেন নাগমতিকে উপেক্ষা করে পদ্মাবতীর প্রণয়ে আসক্ত হতে পারেন অতি সহজেই। এ প্রবৃত্তি রাজা বাদশাহর সহজাত। তিনি ইচ্ছা করলেই এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে শুক পাখি ক্রয় করতে পারেন। ইচ্ছা হলেই মৃগয়ায়

Dhaka University Institutional Repository

যান। এ সবই রত্নসেনের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত। অপরদিকে পদ্মাবতীও রাজকুমারী। সিংহল নরেশও ঐশ্বর্যবান এবং বীর্যবান। তাঁর একমাত্র কন্যা পদ্মাবতী। তাই তাঁর দম্ভ, প্রতাপ, গর্ব থাকা অযৌক্তিক নয়। চিতোর অধিপতিও ধনে, জনে, মানে অতুলনীয়। সিংহল অধিবাসীর কাছে রত্নসেনের যে পরিচয় উত্থাপিত হয়েছে সেখানে একজন দক্ষ সামন্তপতির মূর্তি প্রকাশিত হয়। অপরপক্ষে পদ্মাবতী সামন্ত তনয়া যে রূপে গুণে, জ্ঞানে অনন্যা। সমস্যাসংকুল সাধারণ জীবনে আজকাল প্রত্যহ দ্বন্দ্ব, পীড়ন ও সংঘাতের মাঝে মানব প্রেমকে যেভাবে দেখা যায়, সে যুগের ঐশ্বর্যবিলাসী সামন্ত জীবন ব্যবস্থায় লৌকিক প্রেমকে সেভাবে দেখা যায় না। সামন্ত জীবন ব্যবস্থায় ইচ্ছা পোষণ এবং পুরণের প্রাধান্য বেশি থাকে। "এ প্রেম দুর্বার কিন্তু অজেয় নয়।"[৮০] রত্নসেন–পদ্মাবতীর সামন্ত প্রেমে আমরা এরই প্রতিচ্ছবি প্রত্যক্ষ করি।

রত্নসেনের রূপজমোহ ও প্রেমবোধ, ষোলশত অনুচর নিয়ে সিংহল দ্বীপে যোগী বেশে যাত্রা, শুকের সহাতায় পদ্মাবতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, প্রণয়াসক্ত হওয়া ও মূর্ছা যাওয়া, পদ্মাবতীর শুশ্রূষা, জ্ঞান ফেরার পর সভাসদ নিয়ে সিংহল দ্বীপে গোপনে প্রবেশ, গন্ধর্ব সেনের হাতে ধৃত হয়ে শুলে দেয়ার আদেশ, পরে ভাটের মুখে রত্নসেনের পরিচয় পেয়ে নিজ কন্যাকে তাঁর হাতে সমর্পণ, আড়ম্বরের সাথে বিবাহানুষ্ঠান, বাসর মিলন, নাগমতির পতি বিরহ ও সতীত্ব রক্ষা, রত্নসেন–আলাউদ্দিন সংঘর্ষ, নাগমতি ও পদ্মাবতীর সহমরণ ইত্যাদির বর্ণনা ও চিত্রণ সবই বাস্তব ও যথার্থ হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জি

১। ওয়াকিল আহমদ, বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, ঢাকা, ২০০১ (৫ম সংস্করণ), পৃষ্ঠা–৩১৫।

২। দেবনাথ বন্দোপাধ্যায়, (সম্পাদনা) *পদ্মাবতী* (২য় খন্ড), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা–১৭-১৮।

৩। ওয়াকিল আহমদ, বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, ঢাকা, ২০০১ (৫ম সংস্করণ), পৃষ্ঠা–৩১৭।

৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৩১৭।

৫। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৩১৭।

৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৩১৮।

৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৩২০।

৮। দেবনাথ বন্দোপাধ্যায়, (সম্পাদনা) *পদ্মাবতী* (২য় খন্ড), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা–১২।

৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১৩।

১০। ওয়াকিল আহমদ, বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, ঢাকা, ২০০১ (৫ম সংস্করণ), পৃষ্ঠা–৩২০।

১১। দেবনাথ বন্দোপাধ্যায়, (সম্পাদনা) *পদ্মাবতী* (২য় খন্ড), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা–৩৭।

১২। ওয়াকিল আহমদ, বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, ঢাকা, ২০০১ (৫ম সংস্করণ), পৃষ্ঠা–৩২১।

১৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৩২১।

১৪। দেবনাথ বন্দোপাধ্যায়, (সম্পাদনা) *পদ্মাবতী* (২য় খন্ড), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা–৩২।

১৫। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১৬৯।

১৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১৫৪।

১৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১৬৭।

১৮। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১৮৫।

১৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৩৩।

২০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৩২।

২১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৪০।

২২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৫৪।

২৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৪০।

Dhaka University Institutional Repository

২৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৪১।

২৫। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১৬০।

২৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১৫৭।

২৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১৫৩।

২৮। ওয়াকিল আহমদ, বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, ঢাকা, ২০০১ (৫ম সংস্করণ), পৃষ্ঠা–২৯৭।

২৯। দেবনাথ বন্দোপাধ্যায়, (সম্পাদনা) *পদ্মাবতী* (২য় খন্ড), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা–১৬৩।

৩০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১৭১।

৩১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২১।

৩২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৩৭।

৩৩। অমৃতলাল বালা, আলাওলের কাব্যে হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯১, পৃষ্ঠা–১৫০।

৩৪। দেবনাথ বন্দোপাধ্যায়, (সম্পাদনা) *পদ্মাবতী* (২য় খন্ড), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা–১৬৭।

৩৫। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১৬৮।

৩৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১৬৯।

৩৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১৬৯।

৩৮। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১৬৯।

৩৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১৬৮।

৪০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৪১।

৪১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১৭০।

৪২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১৭১।

৪৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১৭৫।

৪৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১৭৭।

৪৫। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১৮০।

৪৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১৮১।

৪৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১৮২।

৪৮। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১৮২।

৪৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১৮২।

৫০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১৮৪।

৫১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১৮৪।

৫২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

৫৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১৭১।

৫৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১৭১।

৫৫। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২২৬-২২৭।

৫৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২২৪।

৫৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২২৬।

৫৮। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২২৯।

৫৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১৮০।

৬০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১৮৮।

৬১। ডক্টর গোলাম সাকলায়েন, মুসলিম সাহিত্য ও সাহিত্যিক, ঢাকা, ১৯৬৭, পৃষ্ঠা–২৩।

৬২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২৪।

৬৩। দেবনাথ বন্দোপাধ্যায়, (সম্পাদনা) *পদ্মাবতী* (২য় খন্ড), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা–৪০।

৬৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১৫৩।

৬৫। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২৯১।

৬৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৫২।

৬৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৮১।

৬৮। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১৪৩।

৬৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–১৬৮।

৭০। ডক্টর মুহাম্মদ শাহজাহান মিয়া, শ্রীরায় বিনোদ : কবি ও কাব্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯১, পৃষ্ঠা–২৩৪।

৭১। দেবনাথ বন্দোপাধ্যায়, (সম্পাদনা) *পদ্মাবতী* (২য় খন্ড), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা–৩৯৯।

৭২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৪০০।

৭৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৪০২।

৭৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২২৫।

৭৫। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২২৫।

৭৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৩১।

৭৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–২৯।

৭৮। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৩০।

৭৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা–৩০।

৮০। ওয়াকিল আহমদ, বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, ঢাকা, ২০০১ (৫ম সংস্করণ), পৃষ্ঠা–৩০৯।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

একটি বীজ মাটিতে বপন করলেই বিশাল বৃক্ষে পরিণত হতে পারে না তার জন্য প্রয়োজন সঠিক পরিচর্যা এবং পর্যাপ্ত আলো, বাতাস ও পানি। তদ্রূপ একজন মানুষ সমাজে বসবাস করলেই সামাজিক হতে পারে না, প্রয়োজন গভীর জ্ঞান, প্রজ্ঞা, অনুসন্ধিৎসু এবং তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি। সাহিত্য বা শিল্পকর্ম মানব জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। গভীরতর জীবনবোধ, অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিভঙ্গি, সমাজ সচেনতা এবং সৃজনী শক্তির সার্থক সমন্বয়ই শিল্পিমানসের সার্থক প্রকাশ। সাহিত্য কর্মের মাঝেই একজন শিল্পী বাস্তব জীবনের বিচিত্র দিকের প্রতিবিম্বিত রূপকে চিত্রিত করে।

শিল্প রসবেত্তাদের মতে শিল্পীর শিল্প রচনার প্রবণতা তাঁর একান্তই সহজাত। শুধু সৃষ্টিধর্মিতার লালন নয় বরং অতিরিক্ত আরও কিছু প্রয়োজন তা হচ্ছে দক্ষতার কৌশল বিন্যাস। শিল্পীর সৃষ্টিতেই সমাজ ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিবিম্বিত হয়। শিল্পী সমাজ বর্হিভূত নন; রক্তমাংসে গড়া সমাজেরই একজন মানুষ। তাই সমাজের সাথে শিল্পীর সম্পর্ক অভেদ্য, বলা যায় শিল্পী ও সমাজ অভেদাত্মা। সুতরাং সমাজ বহির্ভুত শিল্প মূল্যহীন।

একজন সমাজ সচেতন শিল্পীর শিল্পকর্ম পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে শিল্প বা সাহিত্য মানুষকে, মানুষের জীবন জিজ্ঞাসাকে, সমাজ বিবর্তন ও পরিবর্তনকে সর্বোপরি সমাজ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত সে– সাহিত্য প্রকৃত সাহিত্য। অন্তহীন জীবন জিজ্ঞাসা আধুনিকতা ও বাস্তব চেতনার সুসমন্বয়ে আলাওলের জীবনবোধ যেমন পরিশীলিত তেমনি মার্জিত। অনুবাদে কবির সমাজ বাস্তবতা ও জীবনবোধ আকর্ষণীয়। ঐশ্বর্যে, প্রাচুর্যে এবং বৈচিত্র্যে আলাওলের রচনা আলোকবর্ষী।

আলাওল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গি এবং অন্তর্বাস্তবতা দিয়ে সমাজের প্রতিটি বিষয় অবলোকন করে প্রথাসিদ্ধ সমাজ বাস্তবতার নিয়ম ভেঙ্গে মানুষের বাস্তব জীবনের চিত্রগুলোই কাব্যে উদ্ভাসিত করেছেন। বাঙালিদের যাপিত জীবনের বিভিন্ন সংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস তাঁর কাব্যের একটি বিষয় বিশেষ।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি সমাজ সচেতন ছিলেন বলেই জীবনের সাথে সম্পৃক্ত এসব বিশ্বাস ও সংস্কার রূপায়ণে ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। তিনি ছিলেন বাস্তববাদী কবি।

সমাজ সংস্কৃতি রূপায়ণে যদি অতীতের কিংবা চর্যাপদের সমাজ চিত্র প্রত্যক্ষ করি তাহলে সেখানে আমরা অন্ত্যজ সমাজের অন্তর্বাস্তবতার প্রতিফলন লক্ষ্য করব। আধুনিকতার ছোঁয়া তাদেরকে স্পর্শ করেনি। যদিও নগর জীবনের পরিচয় যৎসামান্যই পেয়ে থাকি। চর্যাপদকর্তাদের অনেকে ছিলেন উচ্চ পদস্থ এবং উচ্চবর্ণের অধিকারী। সমাজ বাস্তবতার অন্তরালে যদি দৃষ্টি দেই তাহলে লক্ষ্য করব বৌদ্ধ সহজিয়াদের গূঢ় রহস্যতত্ত্বের অন্তরালে ক্ষয়িষ্ণু সমাজের অন্তর্বাস্তবতা। চর্যাপদে অন্ত্যজ শ্রেণী বিভিন্নভাবে অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত, নিষ্পেষিত কখনো প্রয়োজনে অথবা কখনো বাধ্য হয়ে। এতদ্ব্যতীত বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয় চর্যাপদে লক্ষ্য করি।

সমাজ স্বভাবতই পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তন সূচিত হয় সময়ের সাথে, রুচির সাথে, সর্বোপরি পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে। সময়ের সাথে সাথে মানুষের অভিরুচির পরিবর্তন হয়। মানুষ উন্নতর জীবন যাপনে আগ্রহী হয়। মঙ্গল কাব্যে এই অভিরুচির বর্হিঃপ্রকাশ কিছুটা হলেও পেয়ে থাকি। যদিও এখানে পরিবর্তন সূচিত হয় দেবতার কৃপায়। কালকেতুর গুজরাটে নগর রাষ্ট্র পত্তন এর ইঙ্গিত বহন করে। নগর রাষ্ট্র পত্তনের মধ্যে আধুনিকতার ছোঁয়া নিহিত। শিক্ষার প্রতি অনুরাগ মঙ্গলকাব্যে প্রত্যক্ষ করি। পাঁচ বছর বয়সে লখিনদরকে গুরুর কাছে পড়তে পাঠানো এর প্রমাণ দেয়। এছাড়া লহনা ও খুল্লরা প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করে চিঠিপত্র লিখতে পারত। অন্ত্যজ শ্রেণীর পরিচয়ও মঙ্গল কাব্যে নিহিত। অভাব অনটনে এদের দিন কাটে। মুকুন্দরাম অতি চমৎকার ভাবে ফুল্লরার বারমাসী বর্ণনার মধ্যদিয়ে সমাজের হতদরিদ্র অভাবী মানুষের চিত্র তুলে ধরেছেন। এরপর ভারতচন্দ্রের সময় অর্থাৎ খ্রিষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে দেখি আধুনিকতার স্পর্শ। গ্রাম্য জীবনের সরলতা নাগর বিলাসিতার রুচি দ্বারা অভিভূত হয়েছে। তাই ভারতচন্দ্রের কাব্য অনেকটাই অভিজাত। তারপরও বাঙালি জাতির অন্তরের সাধারণ আর্তিই প্রতিফলিত হয়েছে– আমার

Dhaka University Institutional Repository

সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে এই উক্তির মধ্য দিয়ে। রামায়ণ ও মহাভারতে বর্ণিত সমাজ অভিজাত সমাজ। রাজরাজাদের কাহিনী, দ্বন্দ্ব, বিদ্রোহ, যুদ্ধ ও মিলন এখানে মুখ্য হয়েছে। সবশেষে হিংসা, দ্বেষ নির্মুল করে সত্য, ন্যায় ও ধর্মের জয় দেখানো হয়েছে।

এরপর আসে ভিন্নধারার সমাজ বাস্তবতা ও জীবনদর্শন। মুসলিম কবি সাহিত্যিক রচিত বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানমূলক কাব্যকাহিনীতে লক্ষ্য করি ভিন্ন ধারা ও ভিন্ন মনস্তত্ত্ব। এই সমস্ত কাব্যকাহিনীতে পাই ভিন্ন ধারার সমাজ বাস্তবতা। এ সকল প্রণয়গাথায় কবি সাহিত্যিকরা মানব মানবীর হৃদয়ের অন্তর্বেদনাকে উপেক্ষা করেননি। মুসলিম কবি সাহিত্যিক রচিত এ সময়ের প্রধান প্রণয়োপাখ্যানমূলক কাব্য কাহিনীগুলি হচ্ছে দৌলত উজীর বাহারাম খানের *লায়লী মজনু* শাহ মুহম্মদ সগীরের *ইউসুফ জোলেখা*, আলাওলের *সতীময়না লোরচন্দ্রাণী* এবং *পদ্মাবতী*।

আলাওল সপ্তদশ শতকের প্রথম দশক (১৫৯৭–১৬৭৩) এর মধ্যে ফরিদপুর জেলার জালালপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। *পদ্মাবতী* (১৬৪৫-'৫২) কাব্যটি তাঁর অনূদিত একটি কাব্য। মালিক মুহম্মদ জায়সীর হিন্দি কাব্য *পদমাবৎ* অনুসরণে তিনি কাব্যটি অনুবাদ করেন। নিঃসন্দেহে এটি একটি কঠিন কাজ। বলা যায় এই কাজটি কবির দক্ষতা ও প্রাণপণ চেষ্টার ফসল। গ্রহণ বর্জনের মাধ্যমে তিনি কাব্যটি সমাপ্ত করেন। আলাওলের সময় হচ্ছে মধ্যযুগের মধ্যগ। আধুনিকতার স্পর্শ তখনও সাহিত্যে পৌঁছেনি। কিন্তু আলাওলের বোধ, প্রজ্ঞা ও তীক্ষ্ণতা ছিল গগনস্পর্শী। হতে পারে তিনি যে পরিবেশের সান্নিধ্যে ছিলেন সে পরিবেশ তাঁকে সাহিত্য রচনায় অনুপ্রেরণা যুগিয়ে তাঁর রুচি ও অভিপ্রায়কে উন্নত করেছে। তিনি জীবনের মূল্যবান সময় কাটিয়েছেন রাজন্যবর্গের সান্নিধ্যে এবং সেখান থেকে গ্রহণ করেছেন জীবন রস। এ জন্যই তার অভিরুচি ছিল এত উন্নত জীবন পিপাসা ছিল সুদূর প্রসারী। কবি তাঁর কাব্যের কাহিনীকে ভাবাবেগ সম্পৃক্ত ও চিতাকর্ষক করার জন্য অতিমাত্রায় আবেগ বিস্তার করেন নি। তাঁর কাব্যে সমাজ সত্য হয়ে উঠে এসেছে মানবিকতার প্রেক্ষাপটে। কবির সমাজবোধ, জীবনবোধ ও মনুষ্যত্ব সর্বজনীনতার আলোকবর্তিকায় উদ্ভাসিত।

Dhaka University Institutional Repository

আলাওলের সমকালীন সমাজ হচ্ছে অভিজাত সমাজ। তিনি যাঁদের সান্নিধ্যে ছিলেন তাঁরা সবাই সামন্ত মূর্তির প্রতিভূ। কোরেশী মাগন ঠাকুর (রোসাঙ্গের প্রধানমন্ত্রী) শ্রীমন্ত সোলায়মান, সৈন্যমন্ত্রী মহাম্মদ খান ও শ্রীচন্দ্র সুধর্ম রাজা সবাই সামন্ত চেতনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এঁদের রাজপ্রাসাদ, পাত্র, মিত্র, সভাসদ, বিলাস ব্যসন, ভোগ, চালচলনে সামন্তধারা প্রবাহিত। আলাওল নিজেও একজন সামন্ত। সুতরাং আলাওলের সমকালীন সমাজ হচ্ছে সামন্ত বা অভিজাত সমাজ। দরিদ্রতা এখানে অনুপস্থিত। এছাড়া বাণিজ্য উপলক্ষে আগত সবাই অভিজাত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। পদ্মাবতী কাব্যে আমরা দুর্গভিত্তিক সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার পরিচয় বেশি পাই। সিংহল, চিতোর ও দিল্লির নগরকে কেন্দ্র করে রাজপ্রাসাদ, দরবার, দুর্গপ্রাকার, পরিখা, তোরণ, বুরুজ, উদ্যান, হাটবাজারের যে বর্ণনা আছে তার সবটাই মূলানুসারী এবং এ জন্যই এ সমাজ অভিজাত সমাজ।

সমাজের শীর্ষে আছেন রাজা তাঁকে কেন্দ্র করে আছে অমাত্য প্রসাদপুষ্ট সামাজিক মানুষ। ভূমিভিত্তিক সামন্তপ্রভুরা ছিলেন সমাজের সুবিধাভোগী। এঁরা যুদ্ধবিদ্যায় যেমন ছিলেন পারদর্শী কাব্যচর্চায় ছিলেন তেমনি উৎসুক। এঁদের কাছে দার্শনিক তত্ত্বাপেক্ষা প্রেম ও যুদ্ধকাহিনী বেশি আকাঙ্ক্ষিত ছিল। জায়সী তত্ত্বাশ্রয়ী করে যে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ জীবনকে *পদমাবৎ* কাব্যে উপস্থাপন করেছেন আলাওল সেই তত্ত্বকথাকে সংক্ষিপ্ত ও স্থানে স্থানে গ্রহণ বর্জন করে সমাজে উপস্থাপন করেছেন। সামন্তভুরা যে রোমান্স রসমুখর কাব্যই শুধু পছন্দ করতেন তেমনটি নয় কারণ *পদ্মাবতী* কাব্যে পুরাণ, বেদ ও সঙ্গীত চর্চার উল্লেখ আছে।

পদ্মাবতী কাব্যের সমাজ বিশ্লেষণে দু'টি ধারা লক্ষ্য করা যায়। একদিকে আলাওলের সমকালীন চেতনা বা সামন্তসমাজ ও অন্যদিকে সাধারণ বৃত্তিজীবী মানুষের চিত্র। সিংহলের রাজা গন্ধর্ব সেন ও চিতোরের রাজা রত্নসেন সামন্তচেতনার উজ্জ্বল নক্ষত্র। একজন অশ্ব হস্তী ও সভাসদ নিয়ে সুরক্ষিত দুর্গে বাস করেন। অন্যজন অস্ত্রে, শাস্ত্রে, জ্ঞানে ও রূপে গুণে সাহসে অধিক। তিনি এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে শুক পাখি ক্রয় করেন। ইচ্ছা

Dhaka University Institutional Repository

হলেই শিকারে যান। শুক পাখির মুখে পদ্মাবতীর রূপের কথা শুনেই প্রথমা স্ত্রীর ভালোবাসাকে উপেক্ষা করে প্রেমাসক্ত হন এটা রাজা বাদশাহর সহজাত।

সামন্ত জীবন চেতনায় ব্যক্তি ও শিল্পী আলাওল এক ও অভিন্ন। রাজকন্যা পদ্মাবতীর যোগ্যপাত্র প্রমাণ করার জন্যই এ পরীক্ষা। পদ্মাবতী রূপ, সৌন্দর্য, পোশাক পরিচ্ছদ, সুরম্যপ্রাসাদ, দাসদাসী, বিলাস, শিক্ষা, অভিপ্রায় ও রুচি নিয়ে সামন্ততনয়ার এক মূর্ত প্রতীক। পদ্মাবতী ও রত্নসেনের প্রেমের উন্মেষ, বিকাশ, প্রণয় সঞ্চার, মিলন ও বাসর প্রভৃতি বর্ণনার মধ্যে যে জীবনবোধ ও রুচির পরিচয় আছে তা অভিজাত জীবনের পক্ষেই সম্ভব।

একজন সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ বোধসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে আলাওল তাঁর নিজের ব্যক্তি অভিজ্ঞতায় *পদ্মাবতী* কাব্যে বর্ণিত সমাজ বাস্তবতার নিরিক্ষে প্রত্যেকটি ঘটনাকে অত্যন্ত জীবন্ত করে উপস্থাপন করেছেন। এখানে প্রধানতই স্থান অলঙ্কৃত করেছে অভিজাত সমাজ। সাধারণ বৃত্তিজীবী মানুষের পরিচয় কম কিন্তু সমাজে তাদের অবদান কম নয়। সিংহল হাটের বর্ণনায় আমরা দেখি বিভিন্ন পসার নিয়ে সাধারণ মানুষের আগমন ঘটেছে। একদিকে আছে উচ্চবিত্ত অবস্থা সম্পন্ন মানুষ যারা মূল্যবান অলঙ্কারাদি বিক্রি করে অন্যদিকে সাধারণ মানুষ যারা স্বল্পমূল্যের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিক্রি করছে। কবি সিংহল হাটের যে বর্ণনা দিয়েছেন সেখানে আবহমান বাঙালি সমাজের একটি নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায়। এখানে যে সমাজ বর্ণিত হয়েছে তা প্রীতি ও প্রেমের বাধনে আবদ্ধ বাঙালির সমাজচিত্রই ফুটে উঠেছে।

সাধারণ মানুষের মধ্যে অন্যতম হলো— নাপিত, নর্তকী, ফুল, বিক্রেতা, চিত্রকর, সিন্দুর, কর্পূর ও আবীর বিক্রেতা। নর্তকী নাচ, গান ও বাজনার মধ্য দিয়ে সমাজে বিনোদনের ব্যবস্থা করে থাকে। কারণ নাচ, গান, বাজনা সব সময়ই সমাজে জনপ্রিয়।

Dhaka University Institutional Repository

আলাওল পদ্মাবতীর কাহিনীতে বিরাজিত ছোট খাট প্রতিটি ঘটনাকে সুগভীর মনন বোধ ও সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে গভীরভাবে অবলোকন করে সমাজের প্রতিটি বিষয়কে সূক্ষ্ম ও সুবিস্তৃতভাবে পাঠক সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন। পদ্মাবতী কাব্যটি আলাওল যে সময়ে রচনা করেন সে সময়ে সাহিত্যে মানব হৃদয়বৃত্তি নিয়ে তেমন আলোচনা দেখা যায় না; দেবতা ও ধর্মনির্ভর কাহিনীর প্রাধান্যই বেশি লক্ষ্য করা যায়। ধর্মাবেগ প্লাবিত দেশে আলাওল রক্তমাংসে গড়া মানব মানবীর সুখ, দুঃখ, হাসি কান্না, জন্ম, মৃত্যু, বিরহ, বেদনা, মিলন, বিবাহ, আনন্দ, উৎসব পার্বণ প্রভৃতির বর্ণনা করেছেন যা পদ্মাবতী কাব্যের সমাজ ও সংস্কৃতির অপরিহার্য উপাদান।

সুদূর আরাকানে বসে কবি পদ্মাবতী কাব্যের সমাজ ও সংস্কৃতিকে এত নিখুঁত ও জীবন্তকরে বর্ণনা করেছেন যে, পাঠককুলকে আবেগে আপ্লুত করে। তিনি উপাদানগুলো বোধ হয় বাংলাদেশ হতে সংগ্রহ করেছিলেন। এ জন্যই এ কাব্যে বর্ণিত সমাজে বাঙালিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া থেকে প্রাপ্ত বয়স্ক পর্যন্ত ঘটে যাওয়া সমস্ত চিত্রই কবি জীবন্ত করে কাব্যে তুলে ধরেছেন। পদ্মাবতী রত্নসেনের জন্মগ্রহণ থেকে শুরু করে তাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রেম, বিরহ, বিবাহ, মিলন বাসর, নাগমতি ও পদ্মাবতীর সুখের সংসার যাপন, রত্নসেনের মৃত্যুর পর দুই রাণীর সহমরণ প্রভৃতি ঘটনা কবি পাঠকের সম্মুখে এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যা তাদের মর্মকে স্পর্শ করে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর জন্মোৎসব পালন, জ্যোতিষী দ্বারা জন্ম পত্রিকা নির্মাণ। তাদের বাল্যশিক্ষার জন্য হাতেখড়ি অনুষ্ঠান সব কিছুর মধ্যে তিনি বাঙালির ঐতিহ্য ফুটিয়ে তুলেছেন। অভিজাত পরিবারের সন্তানের শিক্ষার জন্য তিনি গুরুর শরনাপন্ন হয়েছেন যেখানে সুত্রবৃত্তি, পঞ্জিকা, ব্যাকরণ, অভিধান, সাহিত্য, পুরাণ, বেদ, তর্কশাস্ত্র, অলঙ্কারশাস্ত্র, ছন্দশাস্ত্র ও সঙ্গীতশাস্ত্রের চর্চা হয়। বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে তিনি পোলো খেলার উল্লেখ করেছেন যা রাজপরিবারে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। অশ্বচালন বিদ্যা সামন্ত সমাজে শাস্ত্র চর্চার অন্যতম মাধ্যম ছিল। সম্ভবত এ জন্যই তিনি রত্নসেনকে একজন সফল অশ্বারোহী হিসেবে পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

আলাওল ছিলেন একজন উন্নত রুচিবোধ সম্পন্ন সংস্কৃতিবান ব্যক্তি। সুগায়ক হিসেবে কবির খ্যাতি ছিল। বৈষ্ণবগানেও তিনি ছিলেন পারদর্শী এ কারণেই বোধ হয় সঙ্গীত চর্চার উল্লেখ পদ্মাবতী কাব্যে প্রত্যক্ষ করা যায়।

পদ্মাবতী কাব্যে সমাজ সংস্কৃতি বর্ণনায় সবচেয়ে আকর্ষণীয় পর্ব হচ্ছে রত্নসেন ও পদ্মাবতী বিবাহ খন্ডটি। হিন্দুবিবাহ রীতিকে আদর্শ হিসেবে ধরে প্রতিটি পর্বকে তিনি নিখুঁতভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর কাব্যে সমাজ যেহেতু কখনই তুচ্ছ নয় তাই তিনি জায়সীর আধ্যাত্মিক ভাবনা এবং নায়ক নায়িকার রোমান্টিক ভাবাবেগকে প্রাধান্য না দিয়ে তাদেরকে রক্তমাংসে গড়া মর্ত্যের মানুষ হিসেবে দেখে বিবাহ রীতিকে যথাসম্ভব লৌকিক ও বঙ্গীয় করে তুলে ধরেছেন। তিনি মূলকে বর্জন না করে স্বীয় প্রতিভা ও কবিত্ব দিয়ে বিবাহানুষ্ঠানটিকে মনোরম করে সৃষ্টি করেছেন। গাত্রহরিদ্রা, ষোড়শ মাত্রিকা, পূজা, অধিবাস, বসুধারা, নান্দীমুখ, শ্রাদ্ধ, বরবরণ, কন্যা আনয়ন, শুভদৃষ্টি, কন্যা সম্প্রদান প্রভৃতি ব্যাপারে বঙ্গীয় সংস্কৃতির পরিচয় দিয়েছেন। এর সাথে যোগ করেছেন বৈষ্ণবীয় রস।

রত্নসেন পদ্মাবতীর বিবাহ বর্ণনায় এক দিকে আছে নৃত্যগীত ও বাদ্যের বিবরণ অন্যদিকে আতসবাজি পোড়ানোর বর্ণনা যা সামন্ত নৃপতির বিবাহ বর্ণনার অনুরূপ। যুব সমাজ বাজিপুড়িয়ে, হাউই উড়িয়ে বরযাত্রীকে সম্ভাষণ জানানোর মধ্য দিয়ে কবি আধুনিকতার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। বিয়ে সমাপনান্তে কন্যা বিদায়ের সময় মাতা পিতার অন্তর্বেদনার মধ্য দিয়ে কবি বঙ্গীয় সমাজ সংসারের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। নাগমতির বারমাসী বর্ণনার মধ্য দিয়ে কবি বাঙালি গৃহবধূর অন্তর্বেদনা তুলে ধরেছেন।

এছাড়া কবি পদ্মাবতী কাব্যে বর্ণিত ফুল, ফল, পশুপাখি ও খাবারের মধ্যেও বাঙালিত্ব প্রকাশ করেছেন। অলঙ্কার, বসন, ভূষণের বর্ণনাতে বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে সুসামঞ্জস্য প্রত্যক্ষ করা যায়।

আলাওলের কাব্যে বর্ণিত সমাজ ও সংস্কৃতিতে কিছু অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার লক্ষ্য করা যায়। পদ্মাবতীকে বার বছর বয়সে বিয়ের পিঁড়িতে

Dhaka University Institutional Repository

বসতে দেখে তৎকালীন সমাজে বাল্যবিবাহের ইঙ্গিত পাই। কুসংস্কারের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সতীদাহ প্রথা, বিয়েতে বিধবা বর্জন, টোঁটকা চিকিৎসা, দৈবজ্ঞের বাণী, যাত্রার শুভাশুভ নির্ণয়ে জ্যোতিষীর শরণাপন্ন হওয়া।

বাস্তবিকই মানব জীবনের বৈচিত্র্য নির্ধারণে যুগের প্রভাব অপরিত্যাজ্য। আলাওল যে জীবনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন সে জীবন ছিল ভোগ বিলাসময়। বাইরে নিরাপত্তা জনিত সমস্যা ছাড়া অন্তর্জীবনে তেমন কোন সংকট ছিল না। যেহেতু পদ্মাবতী কাব্যটি রাজা বাদশাহর প্রেম কাহিনী নিয়ে রচিত তাই এখানে স্বেচ্ছা প্রাধান্যতা বেশি পরিলক্ষিত হয়। শুক মুখে পদ্মাবতীর রূপের কথা শুনেই রত্নসেন প্রথমা স্ত্রী নাগমতির অন্তবের্দনাকে উপেক্ষা করে চিতোর অভিমুখে যাত্রা করেন। এ প্রবণতা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থারই ইঙ্গিত। নাগমতির প্রেমাবেগকে উপেক্ষা করে রত্নসেন অতি সহজেই পদ্মাবতীর প্রণয়ে আকৃষ্ট হন। এ প্রবৃত্তি রাজা বাদশাহর সহজাত। অপরদিকে পদ্মাবতী রাজকুমারী। তাঁর দম্ভ ও প্রতাপ থাকাও অস্বাভাবিক নয়।

যোগতত্ত্ব নয়, ভোগতত্ত্বই আলাওলের কাব্যের মূল বক্তব্য। আলাওলের মত জীবন রসিক কবি ছাড়া তৎকালীন সমাজ ও সংস্কৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা সম্ভব হত না। জীবন ভোগের সমস্ত তত্ত্বই *পদ্মাবতী* কাব্যে প্রত্যক্ষ করি। জায়সী সাধক কবি, সূফী সাধক হিসেবে তিনি জগৎ ও জীবনের নশ্বরতাই তাঁর কাব্যে দেখিয়েছেন আর আলাওল ছিলেন তত্ত্বাশ্রয়ী কবি। সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতিটি বিষয়কে তিনি ব্যক্তি অনুভূতি দিয়ে অনুভব করেছেন।

তাই কবির বোধ, প্রজ্ঞান, প্রাগ্রসর চৈতন্য অভিনিবেশিত হয়েছে মানব মনের বাস্তব তত্ত্ব ও তথ্য অনুসন্ধানে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

মূল গ্রন্থ

১। দেবনাথ বন্দোপাধ্যায় (সম্পাদনা) '*পদ্মাবতী*' প্রথম খন্ড, পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৪।

২। দেবনাথ বন্দোপাধ্যায় (সম্পাদনা) '*পদ্মাবতী*' দ্বিতীয় খন্ড, পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৫।

৩। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক (সম্পাদনা) শাহ মুহম্মদ সগীর বিরচিত *ইউসুফ-জোলেখা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা—১৯৮৪।

৪। মোহাম্মদ আবদুল কাইউম (সম্পাদনা), আলাওল বিরচিত *সতী-ময়না লোর-চন্দ্রাণী*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা—১৯৯২।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থ

১। অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় — বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি, কলিকাতা, শরৎ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৮৭।

২। অরবিন্দু পোদ্দার — মানব ধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, শ্রী শান্তিময় প্রিন্টার্স কর্ণার প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, ১৯৮১ (তৃতীয় মুদ্রণ)।

৩। অমৃতলাল বালা — আলাওলের কাব্যে হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯১।

৪। অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায় — বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, কলিকাতা মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১৩৭৮।

৫। অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায় — বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত (১ম খন্ড), কলিকাতা মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১৯৬৩ (২য় সংস্করণ)।

৬। অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায় — বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত (২য় খন্ড), কলিকাতা মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১৯৬২।

৭। অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায় — বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত (উত্তর চৈতন্য যুগ ও অষ্টাদশ শতাব্দী), কলিকাতা মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১৯৬৬ (৩য় মুদ্রণ)।

৮। অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায় — ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য, ১৯৫৯।

৯। অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায় — ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি ও বাংলা সাহিত্য, ১৯৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

১০। সৈয়দ আলী আহসান (সম্পাদনা) — পদ্মাবতী (পূর্ণাঙ্গ স্তুতি খন্ড হতে উপসংহার), আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৬৮।

১১। ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য — বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জী এন্ড কোঃ প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা-৭০০৭৩, ৭ম সংস্করণ, ১৯৮৯।

১২। ডক্টর আহমদ শরীফ — মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, ঢাকা, মুক্তধারা, ১৯৭৭।

১৩। ডক্টর আহমদ শরীফ — বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য (১ম খন্ড), ঢাকা, বর্ণমিছিল, ১৩৮৫ বাং, ১৯৭৮ইং।

১৪। ডক্টর আহমদ শরীফ — বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্যে (২য় খন্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩ইং।

১৫। ডক্টর আহমদ শরীফ — জীবনে সমাজে-সাহিত্য, ঢাকা, আদিল ব্রাদার্স, ১৯৭৪।

১৬। ডক্টর ওয়াকিল আহমদ — বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, ঢাকা, ২০০১ (৫ম প্রকাশ)

১৭। ক্ষেত্রগুপ্ত — প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন, কলিকাতা, গ্রন্থ নিলয়, ১৩৬৬ বাং, ১৯৫৯ খৃ. (১ম প্রকাশ)।

১৮। গোপাল হালদার — বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা (১ম খন্ড), প্রাচীন ও মধ্যযুগ, মুক্তধারা, ১৯৮৬ (৩য় প্রকাশ)।

Dhaka University Institutional Repository

১৯। গোলাম সাকলায়েন	মুসলিম সাহিত্য ও সাহিত্যিক, ঢাকা, ১৯৬৭।
২০। নীহার রঞ্জন রায়	বাঙালির ইতিহাস।
২১। বিনয় ঘোষ	শিল্প সংস্কৃতি ও সমাজ, কলিকাতা, অরুণা প্রকাশনী, ১৯৮০।
২২। বিনয় ঘোষ	বাঙলার নবজাগৃতি, কলিকাতা ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস, ১৯৪৮।
২৩। মমতাজুর রহমান তরফদার	বাংলা রোমান্টিক কাব্যে আওয়াধী হিন্দী পটভূমি, ঢাকা : বাংলা ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭১।
২৪। মমতাজুর রহমান তরফদার	বাংলাদেশের সংস্কৃতির স্বরূপ ও সম্ভাবনা, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪।
২৫। মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা	চর্যাগীতিকা (সম্পাদনা), ঢাকা, ১৩৮৭ বাংলা (৩য় সংস্করণ)।
২৬। মুহম্মদ আবদুল হাই ও ডক্টর আহদ শরীফ (সম্পাদনা)	মধ্যযুগের বাঙলা গীতিকবিতা।
২৭। মুহম্মদ আবদুল হাই	সাহিত্য ও সংস্কৃতি, ঢাকা প্রকাশ ৮৯ বর্ষ ২৯শ সংখ্যা ১৩৫৬ বাংলা (পত্রিকা)।
২৮। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	বাংলা সাহিত্যের কথা (প্রাচীন যুগ), ঢাকা, ১৯৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

২৯। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
(সম্পাদনা) — মালিক মুহম্মদ জায়সী পদ্মাবতী, আলাওল কর্তৃক অনূদিত, ১৯৬৯।

৩০। ডক্টর মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া — শ্রীরায় বিনোদ : কবি ও কাব্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯১।

৩১। ডক্টর রাজিয়া সুলতানা — সাহিত্য বীক্ষণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮।

৩২। ডক্টর রাজিয়া সুলতানা
(সম্পাদনা) — আব্দুল হাকিম রচনাবলী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৯।

৩৩। রমেশচন্দ্র মজুমদার — বাংলাদেশের ইতিহাস, কলিকাতা, কে.পি প্রিন্টার্স, ১৯৭৪ (১ম ও ২য় খন্ড)।

৩৪। শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় — বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা, কলিকাতা, ১৯৫৯।

৩৫। শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় — বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা, কলিকাতা, ১৩৫৩ বাংলা।

৩৬। শ্রীভূদেব চৌধুরী — বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (১ম পর্যায়), দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, ১৯৯৫ (নতুন সংস্করণ)।

৩৭। সুকুমার সেন — ইসলামি বাংলা সাহিত্য, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ (২য় সংস্করণ), কলিকাতা, ১৩৮০।